অলডাস হাক্সলি

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

অনুবাদ
দেবব্রত রেজ



কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৬,

প্রকাশক : ডি, মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

মুদ্রক : বীরেন্দ্রমোহন বসাক
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
১০ ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৯

স্নো (Snow) কিংবা লিভিস্ (Leavis) কার মতটা গ্রাহ্য? স্নোয়ের লেখা, 'দুই সংস্কৃতি'র (The two cultures) বিজ্ঞানবাদিতা কিংবা তার প্রতিবাদে 'বিচমণ্ড বক্তৃতাবলীর' উগ্র, ছুঁৎমার্গী সাহিত্যবাদিতা এব মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য? এই দুই পথ ছাড়া যদি অন্য কোনো বিকল্প পথ না থাকতো অবস্থা তাহলে নিঃসংশয়েই শোচনীয় হয়ে উঠতো। সৌভাগ্য যে মধ্যপন্থাও আছে। বিবদমান এই দুই পক্ষেব দুই মার্গেব চেয়ে অধিকতব বাস্তবানুগ মার্গ আছে এই সমস্যা মীমাংসার। এই প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ ছাড়াও এই মীমাংসা-সমরে আরও পক্ষ আছেন। এঁবা দুজন সাময়িক ভাবে ববববা অর্জন কবেছেন মাত্র। এই মীমাংসা-সমবে লিপ্ত দুই পক্ষেই নামের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তেমনি তাঁদের নামেব তালিকাও দীর্ঘ যাঁবা এই দুই যোদ্ধৃদলের মধ্যে ফলপ্রসূ সন্ধি তথা মোটামুটি নির্বিবোধ অন্যোন্য-পোষকতা (symbiosis) বজায় রাখার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সালিশের কাজ-করেছেন। এই প্রসঙ্গে টি. এইচ্. হাক্সলের নাম স্মরণীয়। ইনি প্রচুব পরিমাণে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ইংরেজি সাহিত্য ও বিদেশী ভাষার অধ্যয়ন-নম্র অথচ মূলতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অনুকূলে প্রচার করে গেছেন। [অধুনা যেমন ক্যালটেক্স (ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব্ টেকনলজি) এবং মাসাচুসেট ইন্‌স্টিটিউট অব্ টেকনলজি (এম্. আই. টি) এই 'নম্রীকরণ' চালু করেছেন।] অপর দিকে ম্যাথু আরনল্ড-এর নাম স্মরণীয়। ইনি যে শিক্ষার অনুকূলে প্রচার করেছেন তার মূল ভিত্তি প্রধানতঃ সুকুমার বিদ্যা, বিশেষ ক'রে গ্রীক-লাতিন বিদ্যা, কিন্তু তা ততটুকু

বিজ্ঞানদ্বারা নম্র যতটুকু এই বর্তমান অ-গ্রীক জগতের বৈলক্ষণ্য হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রয়োজন হ'লে হাক্সলে নিশ্চয়ই আরনল্ডের মতো মানতে স্বীকৃত হ'তেন যে মানুষ, এমনকি মানুষের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষ, 'সেই লোমশ সলাঙ্গুল লম্বকর্ণ সম্ভবতঃ শাখাবিহারী চতুষ্পদ তার প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন এমন কিছু বহন করেছে যা কালক্রমে চারুসাহিত্যের প্রয়োজন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।' কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই একথা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না যে আমাদের সেই লোমশ পূর্বপুরুষ তার স্বভাবের মধ্যে গ্রীকভাষা সৃষ্টির অনিবার্যতা বহন করেছে।

বরং তিনি এই ধারণাই পোষণ করতেন যে তার চৈতন্য বিকাশের এই আধ্যাত্মিক প্রবণতার মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের বিবিধ বিধি আর তাদের পরিণাম আবিষ্কারের অনিবার্যতা।

হাক্সলে যাদের নাম দিয়েছিলেন 'সংস্কৃতির পুরুত' সেই পুরুতদের প্রতিনিধি একদিকে আর অপরদিকে 'যা' দিকে বেচারা মানবিকতা-বাদী সংস্কৃতির 'নেবুকাডনাজার' বলে মনে করতো' তাদের প্রধান প্রতিভূ, এই দুই পক্ষের মধ্যে আজ থেকে আশী বছর পূর্বে সংঘটিত বিখ্যাত বিতর্কের পর বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতি অথবা চারুসাহিত্যাশ্রয়ী সংস্কৃতি অথবা বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয়ের মিলিত সংস্কৃতি এদের কোন্‌টা শ্রেয় এইসব বিকল্প প্রশ্নের উপর প্রচুর আলোচনা লিপিবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। এই বিতর্কে সর্বাধুনিক সংযোজন অধ্যাপক লাইয়োনেল ট্রিলিং (Lionell Trilling) ও ডঃ রবার্ট ওপেনহাইমেরের (Dr. Robert Oppenheimer) আলোচনা।

১৯৬২ সালের জুন সংখ্যার 'Commentary'-তে প্রকাশিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে অধ্যাপক ট্রিলিং লিভিস-স্নো বিতর্কের সার সংকলন করেছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণ আলোচনা করেছেন। তারপর

১৯৬২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে. ডঃ ওপেন-হাইমেরের প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও কৃষ্টি' (Science and Culture)। তাঁর প্রবন্ধ যথেষ্ট সারবান বটে কিন্তু তা বিশেষভাবে মৌলিক নয়। এডিংটন (Eddington) যা গত তৃতীয় দশকে বলতে চেষ্টা করেছেন তাই-ই তিনি বলেছেন এবং তাও বলেছেন কিছুটা ঘোলাটে ভাষায়। তিনি যা বলেছেন তা যে কোনো পদার্থবিদ্‌ই বলবেন যদি তিনি চারুকলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, যদি তাঁর অন্তরঙ্গ বলে একটা জীবন থাকে এবং যদি জনকল্যাণ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধ্যাপক ট্রিলিং-এর আলোচনার মতো বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্পর্কিত এই সব আলোচনা এতো নিরাকার এবং এতো ব্যাপক যে তারা বিষয়ের উপর বিশেষ আলোকপাত করে না। এই আলোচনায় আমি এই বহু বিতর্কিত বিষয়কে ওপেন-হাইমের, ট্রিলিং, লিভিস, স্নো ও তাঁদের ভিক্টোরীয় যুগের পূর্বসূরীদের ব্যাপক আলোচনার ভিত্তির চেয়ে আরও সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

সাহিত্যের ধর্ম কি? সাহিত্যের মনস্তত্ত্ব কি? সাহিত্যিক-ভাষার প্রকৃতিই বা কি? আর এর ধর্ম, মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানের ধর্ম, মনস্তত্ত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্যই বা কোথায়? অতীতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের কী চেহারা ছিল? বর্তমানেই বা কী এর চেহারা? আর তা ভবিষ্যতেই বা কেমন হবে? রসগত লাভের বিচারে আজকের বিংশশতাব্দীর সাহিত্যসাধকের পক্ষে বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চা কতদূর ফলপ্রসূ? এই প্রবন্ধে আমি এই সব প্রশ্নেরই মীমাংসার প্রয়াস পাবো।

দুই

আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতাই একান্তভাবে ব্যক্তিগত। কিন্তু কোনো কোনো অভিজ্ঞতা অপর সব অভিজ্ঞতার তুলনায় ঐকান্তিকতায় ন্যূন। ন্যূন বলছি এই অর্থে যে একই প্রকার অবস্থায় বেশীরভাগ স্বাভাবিক মানুষ একই প্রকারের অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং এইসব অভিজ্ঞতার লিখিত বা মৌখিক প্রকাশ যে একই প্রকার হ'বে তা বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু যে সব অভিজ্ঞতা একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাদের সম্পর্কে একথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন একদল লোক একটা বিশেষ গৃহদাহ লক্ষ্য করে তখন তাদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাগুলি একই প্রকার হওয়াই সম্ভব। এই দলের মধ্যে আবার যারা এই গৃহদাহের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধুনা-প্রচলিত বিদ্যা তথা দহনক্রিয়ার রীতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-নির্ভর চিন্তায় চেষ্টিত তাদের বিচারপ্রসূত অভিজ্ঞতা যে একই প্রকারের হবে তা স্বাভাবিক। অর্থাৎ ভাষান্তরে বলা যায় যে মাত্রাস্পর্শ (Sense impression) এবং বুদ্ধি-আশ্রিত চিন্তা এতো একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর নয় যাতে তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান অসম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে। এবার দর্শকদের অনুভবের দিকটা বিচার করা যাক। এই দলের কোনো একজন বহ্ন্যুৎসব দেখে যৌন উত্তেজনা অনুভব করতে পারে, অন্যজন সুকুমার ভাবরসে আপ্লুত হতে পারে, কেউ বা ভীতি কেউ বা সমবেদনা কেউ বা আবার অমানুষিক ক্রূর আহ্লাদ অনুভব করতে পারে। এইসব অভিজ্ঞতা স্পষ্টতই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অর্থে এই সব অভিজ্ঞতা

তর্কনির্ভর চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী একান্ত।

আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে: মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত সার্বজনিক সেইসব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও তাদেব আদানপ্রদানেব উপায় হলো বিজ্ঞান। সাহিত্যেরও কাববার এই ধবনের সার্বজনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তবে তা এতটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। সাহিত্যেব প্রধান উপজীব্য মানুষের অপেক্ষাকৃত ঐকান্তিক অভিজ্ঞতা এবং একপক্ষে বিভিন্ন আত্ম-সচেতন ও সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্তার লোক আর অপবপক্ষে বাহ্যসত্তার লোক, যুক্তিব লোক, সামাজিক সংস্কার আর সঞ্চিত চল্‌তি তথ্যের লোক—এই দুই পক্ষেব পাবস্পরিক প্রভাব।

তিন

বৈজ্ঞানিক প্রথমে তাঁর নিজের ও অপরের বিজ্ঞাপিত সার্বজনিক অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে পর্যবেক্ষণ করেন, পরে তাঁর নিজস্ব কৃষ্টিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত মৌখিক কিংবা গাণিতিক ভাষায় এইসব অভিজ্ঞতা অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ ধারণা নির্মাণ করেন, তারপর এইসব ধারণাকে একটা তর্কশুদ্ধ সুসমঞ্জস প্রণালীতে বিধিবদ্ধ করেন। পরিশেষে এইসব ধারণার ব্যবহারিক সংজ্ঞা (operational definition) নির্ণয় করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে তাঁর তর্কশুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি 'ব্যক্তির বাইরে' যে ঘটনার বিশ্ব সেই বিশ্বের বিশেষ বিশেষ দিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত।

সাহিত্যিকও তাঁর দিক থেকে প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং ভাষার লোকে সংঘটিত ঘটনার যে অভিজ্ঞতা—তা ব্যক্তিগতই হোক বা সার্বজনিকই হোক—সেই অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষক, প্রবন্ধক ও প্রতিবেদক। এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিশেষ বিশেষ দিক থেকে বিজ্ঞানের বহুবিভাগের বিচার্যবস্তু। এরাই আবার বিবিধ কাব্য, বহুতর নাটক উপন্যাস ও নিবন্ধের উপাদান। একদিকে বৈজ্ঞানিক যেমন সর্বপ্রযত্নে তাঁর নিজের ও অপরের অপেক্ষাকৃত ঐকান্তিক অভিজ্ঞতাকে পরিহার করে চলেন, অপরদিকে তেমনি সাহিত্যিক যা একান্তভাবে সার্বজনিক তার সীমার মধ্যে নিজেকে কখনই দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখেন না। বাইরের সত্তাকে তিনি সবসময়ই ব্যক্তির আন্তর-ভুবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। অন্য-সকলের সঙ্গে তিনি যে উপপত্তির সরিক সেই উপপত্তি তাঁর নিজস্ব অপ্রতিবেদ্য অনুভবে পর্যবসিত হয়।

উদ্দাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সবসময় প্রচলিত কৃষ্টির আবরণকে ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করে। একই বিষয়বস্তু সাহিত্যশিল্পী একভাবে ব্যবহার করেন আর বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন আর-এক ভাবে।' বৈজ্ঞানিক কতকগুলি বিশেষ ঘটনা পরীক্ষা কবেন, তারপর এই বিশেষ বিশেষ ঘটনার সমস্ত প্রকার সমতা ও সাদৃশ্য সযত্নে লক্ষ্য কবেন এবং পরিশেষে এই পর্যবেক্ষণ থেকে এমন একটা সাধারণ তত্ত্ব নির্গলিত কবে আনেন যার পবিপ্রেক্ষিতে (এই তত্ত্ব পবিলক্ষিত তথ্যেব ভিত্তিতে পবীক্ষিত হওয়ার পব) বাকি সমস্ত সদৃশ ঘটনা বিশ্লেষিত ও বোধগম্য হতে পাবে। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার বৈশিষ্ট্য বোঝা তাঁব মুখ্য লক্ষ্য নয়। তাঁর প্রধান লক্ষ্য বিচিত্র ঘটনা থেকে এমন একটা সাধাবণ ধর্ম আবিষ্কাব কবা যার সাহায্যে একটা বিশেষ শ্রেণীর সমস্ত ঘটনা বোধগম্য হয়ে উঠবে। যে কোনো অভিজ্ঞতার প্রতি—তা অপেক্ষাকৃত সার্বজনিক অভিজ্ঞতা হলেও--যে কোনো অভিজ্ঞতার প্রতি সাহিত্য-শিল্পীব সহজাত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বারংবাব পবীক্ষা তাঁর কাজ নয়। এবং তাঁর কাজ নয় অভিজ্ঞতা চুঁইয়ে একবাশ ব্যবহাবের উপযোগী সাধারণ তত্ত্ব নির্গলিত করে আনা। তাঁব কাজ কোনো ব্যষ্টিতে অভিনিবেশ : এই ব্যষ্টিকে এমন একাগ্রভাবে বিচাব কবা যাব ফলে এই ব্যষ্টি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ স্বচ্ছরূপ ধাবণ করবে। সার্বজনিক হোক, ব্যক্তিগত হোক, প্রত্যেক পৃথগ্‌ভূত বিষয় ভূমার দিকে খোলা এক-একটা গবাক্ষ।

'কিং লিয়ার,' 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' অভূতপূর্ব অবস্থায় পতিত অতিমাত্রায় বিশিষ্ট কয়েকটি নায়কের রোমহর্ষক জীবনকাহিনী। কিন্তু ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার উভয় জগতে যুগপৎ ঘটমান, অনন্য এবং অভাবনীয় ঘটনার এইসব কাহিনীর আশ্রয়ে সেক্‌সপীয়র মঞ্চের জগৎ থেকে বিশ্বজগৎ পর্যন্ত, রাজনৈতিক জগৎ থেকে মানস ও শারীর জগৎ পর্যন্ত, নিছক মানুষী জগৎ থেকে

জ্ঞানাতীত চৈতন্যের লোক পর্যন্ত স্তরে স্তরে প্রকট চিত্ত-প্রবোধক সত্যকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অলৌকিক প্রতিভার বলে তা' আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত করেছেন। পদার্থাশ্রিত বিজ্ঞান তখন থেকেই অগ্রসব হতে বইল যখন থেকে বিজ্ঞান অন্বেষকরা তাঁদের দৃষ্টিকে পদার্থেব গুণ থেকে সবিয়ে তাদের পরিমাণের দিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারের সমগ্রতা থেকে সরিয়ে তাদের সূক্ষ্ম সংগঠনের দিকে, ইন্দ্রিয়পথে চেতনাগোচব প্রত্যক্ষ আকাব থেকে সরিয়ে তার দর্শনাতীত, স্পর্শাতীত ও শুধুমাত্র বিশ্লেষণী বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য অংশগুলিব দিকে নিবদ্ধ করতে আবম্ভ করলেন। পদার্থাশ্রিত যত বিজ্ঞান তাবা সব সূত্রাশ্রয়ী (nomothetic)। এই বিজ্ঞানগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যাত্মক সূত্রে উপনীত হওয়া। এই সূত্রগুলি তখনই প্রয়োগযোগ্য ও জ্ঞানলাভে সহায় হয়ে ওঠে যখন এই সূত্রগুলির সাহায্যে এই আপাতদৃশ্যমানেব অন্তবালে যে দর্শনাতীত ও স্পর্শাতীত বিরাজমান সেই অদৃষ্ট ও অস্পৃষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে নির্ণয় করা হয়। এই অদৃষ্ট ও অস্পৃষ্টগুলি বর্ণনার অতীত। এরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাধারণ আপাতগোচরতা থেকে অনুমান দ্বারা তাদের জ্ঞান সম্ভব। অপরপক্ষে সাহিত্য সূত্রাশ্রয়ী নয়। সাহিত্য 'ভাবচিত্র আশ্রয়ী' (idiographic)। নিয়মবদ্ধতা আব ব্যাখ্যাত্মক সূত্র আবিষ্কার সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। সাহিত্যেব লক্ষ্য আপাতগোচবতার (appearance) বর্ণন, অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ আকারের গোচরীভূত গুণের বিবরণ। সাহিত্যের বিষয় মূল্যায়ন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিচার। সাহিত্যের বিষয় 'আন্তরচিত্র' (inscape) ও আন্তরসার এবং সর্বোপরি বস্তুর 'অস্তিরূপ' (istigkeit), চিন্তার মধ্যে যা অচিন্ত্য আর নিরবধি কালব্যাপ্ত বিরামহীন বিলয় ও সৃষ্টির কালাতীত 'তথতা' (suchness)। সেই জগৎ সাহিত্যের যে জগতে মানুষ জন্ম নেয়, জীবন-

ধারণ করে ও জীবলীলা সাঙ্গ করে, যে জগতে তাঁর প্রেম ঘৃণাদ্বারা জারিত, যে জগতে তার জয় পরাজয়, আশানিরাশা ও অনুভব, যে জগৎ তার ক্লেশ ও ভোগের, সুস্থ ও বিকৃত বোধের, সামাজিক পেষণ আর ব্যক্তিগত আবেগের, যে জগতে একদিকে যুক্তি অপরদিকে রিপু, একদিকে প্রবৃত্তি অপরদিকে সামাজিক আচার, একদিকে সার্বজনিক ভাষা অপরদিকে ব্যক্তিগত অনুভব আর ইন্দ্রিয়স্পর্শ, একদিকে মানুষে মানুষে সহজাত ভিন্নতা অপরদিকে রীতির শাসন, সামাজিক ভূমিকা আর প্রচলিত কৃষ্টি নির্ধারিত ভাবগম্ভীর অথবা উপহাস্য সামাজিক কল্পানুষ্ঠান (rituals)।

প্রত্যেক মানুষ এই বহুরূপী জগৎ সম্পর্কে সচেতন। সে জানে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘোলাটেভাবে জানে) এই জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী এবং কেমন। তা ছাড়া, নিজের দিক থেকে বিচার করে সে বুঝতে পারে এই জগতের সঙ্গে অপর সকলেই বা কী ভাবে সম্পর্কিত এবং তাদের কাছ থেকে স্বভাবতই সে কী ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে। এই যে অন্য সকলের বাঁচামরার জগৎ বৈজ্ঞানিকও সেই জগতে মগ্ন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকে। কিন্তু যখন তিনি পেশাগত ভাবে রাসায়নিক বা পদার্থবিদ বা শারীরবিজ্ঞানবিদ তখন তিনি এক সম্পূর্ণ পৃথক জগতের অধিবাসী। এই জগৎ স্বভাবসিদ্ধ আপাতগোচরতার জগৎ নয়। এ জগৎ অনুমানগ্রাহ্য সূক্ষ্ম উপাদানের জগৎ; এ জগৎ অন্যোন্য-নিরপেক্ষ ঘটনা আর গুণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নয়, এ জগৎ বিধিবদ্ধ পরিমিতির (quantified regularities) জগৎ। জ্ঞানই শক্তি এবং অমূর্তভাব আর অনুমানের অনুভবোত্তর জগতের ঘটনার জ্ঞান প্রয়োগ ক'রে বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদরা এই বহুধাবিচিত্র যে স্থূল জগতের মধ্যে মানুষ জন্মরূপ সুকৃতি আর মৃত্যুরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন সেই জগৎকে শাসন পরিচালন ও পরিবর্তন করার প্রভূত ও ক্রমবর্ধমান

শক্তি অর্জন করেছেন। অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও এ ঘটনা সত্য।

প্রত্যেক বিজ্ঞানে অনুমানের একটা বিশেষ কাঠামো আছে। পদার্থবিদ্যায় তথ্যের সমন্বয় এক পদ্ধতিতে আর পক্ষিবিজ্ঞানে তথ্যের সমন্বয় অন্য পদ্ধতিতে (পক্ষিবিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত যতটা সূত্রাশ্রয়ী তার চেয়ে অনেক বেশী লক্ষণবিচারের ওপর নির্ভরশীল)। বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য এমন একটা অদ্বৈত (monistic) জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ (প্রতীকের স্তরে এবং অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য সূক্ষ্ম উপাদানের ভিত্তিতে) যে জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়ে এই জগতের অতিব্যাপ্ত বৈচিত্র্য বিশেষ এক ঐক্যে সরলীকৃত হ'য়ে আসবে আর অন্যোন্যনিরপেক্ষ ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সুসজ্জিত হ'য়ে এবং সরল হ'য়ে একটিমাত্র শৃঙ্খলার মধ্যে বিধৃত হ'তে পারবে। এই লক্ষ্যে বিজ্ঞান কোনো দিন উপনীত হবে কিনা তা ভবিষ্যৎই জানে। সেই অবস্থা যতদিন না আসবে ততদিন বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার নিজস্ব একটা নিয়ন্ত্রক ধারণা সমষ্টি থাকবে আর থাকবে তার নিজস্ব বিচারপদ্ধতি।

সাহিত্যসাধক যখন বিশেষভাবে সাহিত্যিকভাবাপন্ন তখন তিনি ঘটনার অনন্যতাকে স্বীকার করেন, স্বীকার করেন জগতের বৈচিত্র্য এবং বহুরূপিতাকে, স্বীকার করেন ধারণাশৃঙ্খলের বাইরের সহজ স্বাভাবিক জগতের মৌলিক দুর্জ্ঞেয়তাকে তার আপন-মূল্যে, আর সর্বোপরি স্বীকার করেন সেই জগতের অস্তিত্বকে যে জগৎ তার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য এবং রহস্য নিয়ে তাঁর মুখোমুখি অবতীর্ণ। আর, একে স্বীকার করে নিয়ে বিশৃঙ্খল ও নিরবয়ব পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে সুসংবদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করার আপাতস্বভাববিরুদ্ধ কর্মে নিজেকে লিপ্ত করেন।

চার

ব্যক্তির একান্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ ও তা জ্ঞাপনের মোটামুটি উপযুক্ত পদসম্ভার আছে প্রত্যেক ভাষাতেই। মূক না হ'লে যে কেউ 'কী ভয়!' 'বাঃ। কী সুন্দর।' এই ধরনের কথা বলতে পারে এবং তার শ্রোতারা তার এই বক্তব্যের মর্ম সম্বন্ধে স্থূল হলেও কাজ চালাবার উপযোগী একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারে। নিকৃষ্ট সাহিত্য (অন্তরময়তার মানদণ্ডে নিকৃষ্ট অথচ আধা-বৈজ্ঞানিক এবং মানুষের অপেক্ষাকৃত সার্বজনিক অভিজ্ঞতার প্রকাশরূপে মোটামুটি চলনসই) দৈনন্দিন সাধারণ ভাষার এই 'কী সুন্দর।' 'কী ভয়!' ইত্যাদি ধরনের প্রকাশের যে গণ্ডী তা অতিক্রম করে না। উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ অন্তরময়তার বিচারে উৎকৃষ্ট) সাহিত্যে প্রচলিত ভাষার স্থূলতার পরিবর্তে সূক্ষ্মতর এবং গভীরতর ব্যঞ্জনা স্থান পায়। আসলে প্রত্যেক কথাই সামান্য লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ একই শ্রেণীর অভিজ্ঞতার সেইসব দিকগুলির প্রতীক যে দিকগুলির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। অভিজ্ঞতার যেসব খণ্ডগুলি অসামান্য, বিশৃঙ্খল, অসার্বজনিক তারা সাধারণ ভাষার আয়ত্তের বাইরে। সাহিত্যশিল্পী সর্বপ্রযত্নে মানুষের একান্ত অভিজ্ঞতার ঠিক এই দিকগুলিরই প্রকাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত। এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সাধারণ প্রচলিত ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

তাই প্রচলিত ভাষা আর প্রচলিত পদান্বয় রীতি যে সব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে স্পষ্টতঃ অপারগ সেই সব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য, অন্ততঃ আংশিকভাবে প্রকাশ করার জন্য, সাহিত্যশিল্পী হয় কোনো এক ধরনের অসার্বজনিক ভাষা স্বয়ং

নির্মাণ করে নেন, কিংবা এই ধরনেব কোনো ভাষা অন্য কোথাও থেকে ধাব কবে নেন। প্রত্যেক দায়িত্বশীল লেখকের মুখ্য কাজ 'গোষ্ঠীব কথায় বিশুদ্ধতম অর্থেব আবোপ' (১)। এইভাবে বিশোধিত কথাকে অভূতপূর্ব কোনো বীতিতে গ্রথিত কবে আমবা আমাদেব একান্ত অভিজ্ঞতাব সমস্ত সূক্ষ্মতা, তাব বিচিত্র-বিভূতি এবং অপুনবাবৃত্ত অসামান্যতাকে, প্রতীকত্বেব পর্যায়ে কোনো একভাবে পুনঃস্জন কবে, সার্বজনিকরূপে অপবেব কাছে জ্ঞাপন কবতে পাবি। তবু শিল্পী যখন সাফল্যেব চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনো তাঁব প্রয়াস কী নৈবাশ্যজনক!

এই বাক্‌যন্ত্রেব যে চালনী তাব ছিদ্রপথে
ঝবে পড়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনঃকণা,
যে কণাবা বড় তাবা পড়ে থাকে অন্তবালে
অস্পষ্ট বোধেব বিপুল আধাবে ;
কোনোদিন ভূমিষ্ঠ হয় না তাবা। (২)

সন্তবা দ্যুলোকে যা অনুভব কবেন তা 'স্পর্শেব বাইবে, শ্রবণেব অতীত' (৩)। যে মানুষ বাস কবে এই ভূলোকে, তাব আনন্দেব যে আবেশ আব যন্ত্রণাব যে তীব্রতা তাও এমনি স্পর্শাতীত, এমনি শ্রবণাতীত। এবা আস্বাদনেব অতীত, এমনকি বোধেবও অতীত। 'নিখিল কবির সমস্ত লেখনী' আব সকল বৈজ্ঞানিকেব সমস্ত বিদ্যুদণুবীক্ষণ যন্ত্র (electron microscopes), পবমাণুবিচ্ছেদক (cyclotron) আব গণনাযন্ত্রেব (computers) ধবা ছোঁয়াব ওপারে আছে চিরনৈঃশব্দ্য, চিবমূক অস্তিত্ব।

পাঁচ

সাধারণ ভাষা সাহিত্যশিল্পের প্রকাশ-মাধ্যমরূপে অপ্রতুল। তেমনি বিজ্ঞানের প্রকাশ-মাধ্যমরূপেও। 'কৌমকথায় শুদ্ধতর ভাবের আরোপ' করার প্রয়োজন যেমন সাহিত্যিকের তেমনি বৈজ্ঞানিকেরও। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-শুদ্ধতা আর সাহিত্যিক-শুদ্ধতা একই প্রকারের শুদ্ধতা নয়। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য হোলো একটামাত্র বিষয়কে একবারেই বলা, আর তা' দ্ব্যর্থহীন ভাবে, সব চেয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলা।

এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি ভাষাকে সরল করেন এবং সৃষ্টি করেন 'জারগন' (jargon) বা অব*-ভাষা। অর্থাৎ তিনি কথ্য ভাষার শব্দভাণ্ডার ও পদান্বয়রীতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করেন যার ফলে প্রত্যেক পদসমষ্টির একমাত্র একটাই ব্যুৎপত্তি সম্ভব হয়। কথ্যভাষার শব্দভাণ্ডার ও পদান্বয় পদ্ধতি যখন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে স্থূল বলে প্রতিপন্ন হয় তখন তিনি একটা নতুন টেকনিকাল ভাষা বা অবভাষা সৃষ্টি করেন এবং যে সীমিত অর্থ নিয়ে তিনি পেশাগতভাবে ব্যাপৃত সেই সীমিত অর্থের প্রকাশ-ব্যাপারে এই বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত ভাষাকে ব্যবহার করেন।

বৈজ্ঞানিক ভাষা তার বিশুদ্ধতম অবস্থায় আর কথাশ্রিত ভাষা থাকেনা, তা গাণিতিক প্রতীকের ভাষাতে পরিণত হয়।

সাহিত্যশিল্পী তাঁর গোষ্ঠীর ভাষাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একভাবে বিশুদ্ধ করে তোলেন। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য এককালীন একটা মাত্র বিষয়কে প্রকাশ করা। আমরা জোর করে বলতে পারি যে এ

* 'অব' অর্থে বিজ্ঞানও হয়।

লক্ষ্য সাহিত্যশিল্পীর লক্ষ্য নয়। মানুষ একই কালে বহু স্তরে জীবনযাপন করে। তাই তার জীবন যুগপৎ বহু অর্থ বহন করে। বহু বিচিত্র ঘটনার বিবৃতি ও তাদের বহুবিধ তাৎপর্য প্রকাশের উপায় সাহিত্য। সাহিত্যশিল্পী যখন তাঁর গোষ্ঠীর শব্দগুলিকে শুদ্ধতর অর্থে ব্যবহার করেন তখন তাঁর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এমন একটা ভাষা নির্মাণ করা যা বিশেষ কোনো বিজ্ঞানবিষয়ের বিশেষ কোনো অর্থপ্রকাশের মাধ্যম নয়। পক্ষান্তরে মানুষের অতি-অন্তরঙ্গ লোকেব এবং অপেক্ষাকৃত সার্বজনিক লোকের অভিজ্ঞতায় যুগপৎ যে বহু ইঙ্গিতময়তা বর্ত্তমান এইভাষা তার প্রকাশেব বাহন। ভাষাকে তিনি মার্জিত করেন তাকে সরল করে কোনো বিশেষ অবভাষায় পরিণত করতে নয়। ভাষাকে তিনি মার্জিত করেন তার গভীরতা ও প্রসারকে বাড়িয়ে, তাকে নানা ইঙ্গিতে অনুরণিত ক'রে, নানা অনুষঙ্গের স্বব সমাবেশ জুড়ে, নানা সহ-ভাবের তারায় এবং নানা স্বরিত রহস্যের মুদারায় মন্দ্রিত করে।

কা'কে গোলাপ বলে? কা'কেই বা ড্যাফোডিল বলে? কা'কেই বা বলে লিলি বা স্থলপদ্ম? এই প্রশ্নগুলিব একতরফের উত্তর পাওয়া যেতে পারে জৈবরসায়ন, কোষবিজ্ঞান (cytology) এবং জননবিজ্ঞানের (genetics) ভাষায়। বর্ণনাটা এমনি ভাবে আরম্ভ হতে পারে :

'রাইবোনিউক্লাইক এসিড (আর এন এ—R N A)-এর একটা রূপান্তর (এর নাম মেসেঞ্জার বা 'হরকরা' আর এন এ) কোষের কেন্দ্রস্থিত বংশবীজ (gene) থেকে বার্তা বহন করে নিয়ে যায় তার চতুর্দিকে আপ্লুত সেই কোষপদার্থে যেখানে জৈববস্তুর নির্মাণ কার্য চলে'। এইভাবে অবিরাম এগিয়ে চলে বর্ণনা নানান বৈচিত্র্যে। গোলাপ শুধু গোলাপ, রাইবোনিউক্লাইক এসিড (আর এন এ), ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লাইক এসিড (ডি এন এ),

নানা য়্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরী, পলিপেপটাইডদের (poly peptides) শৃঙ্খল……ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনার চেয়ে নীচুস্তরে (-গোলাপ আর ড্যাফোডিল সম্পর্কিত প্রবন্ধে) যে ধরনের রেওয়াজী উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা থাকে প্রচলিত কোষগ্রন্থে তা অনেকটা এই ধরনের : -

'গর্ভপত্রগুলি একটি ধারক নলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তার মুখ থেকে বেরিয়ে থাকে শুধু রজঃকোষগুলি : অর আর স্পর্শক এই দুই ভিন্ন ভিন্ন দিকে (radially and tangetially) বারংবার বিভাজনের ফলে অসংখ্য পরাগকেশর সৃষ্ট হয়…স্বাভাবিক অবস্থায় গোলাপ থেকে কোনো মধুক্ষরণ ঘটে না, শুধু বর্ণ, সৌরভ ও প্রচুর পরাগখাদ্যই পতঙ্গের আকর্ষণ…'ক্যানিনা' নামের শুনমুখী গোলাপের সুপক্ক নিতম্ব থেকে গোলাপের মোরব্বা তৈরী হয়। এই বস্তু শুধু বটিকা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়…'। নার্সিসাস সিউডো-নার্সিসাস (*Narcissus pseudonarcissus*) অর্থাৎ চলতি কথায় ড্যাফোডিল সম্বন্ধে এমনি কিছু একটা লেখা থাকে : 'এ কুসুম আকারে বেশ বড়, রঙে হলুদ, সুরভিযুক্ত, সামান্য ঝুলেপড়া, পুষ্পপর্ক (corolla) গভীর খাঁজে খাঁজে ছ'টা নালীতে ভাগ করা, মাঝখানে একটি ঘণ্টা আকারের মধুকোষ, মধুকোষের কানা ঈষৎ কোঁকড়ানো…পরাগকেশরগুলি পরাগপাত্রের চেয়ে খাটো, করণ্ডক (anther) গুলি আয়তাকার ও কেন্দ্রাভিগামী ; গর্ভকোষ বর্তুলা-কার তার মধ্যে তিনটে নালী, কন্দগুলি (bulb) বড় এবং তারাও বর্তুলাকার। প্রসিদ্ধি আছে কন্দ ও ফুল উভয়েই রেচকগুণ বর্তমান।'

কোষ বা বংশবীজ (gene) কিংবা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, কন্দের বর্তুলত্ব, পরাগকেশরের সংখ্যা, বটিকানির্মাণ বা বিরেচক পাক পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে সাহিত্যশিল্পীর কোনোই কৌতূহল

নাই। তাঁর নিজের ও অপরের পুষ্পাশ্রয়ী অনুভব ও সেই অনুভবের বহুবিচিত্র দ্যোতনা তাঁর বিষয়। তিনি মানুষ, আর জীবিকার জন্য স্বেদস্রাব মানুষমাত্রেরই অপরিহার্য। তাই যে' ভাগ্যবতী নলিনীদের মাঠে শ্রম বা গৃহে সীবন কিছুই করতে হয়না তাদের কথা ভাবতে বসেন কবি।

কখনো তিনি অতিরিক্ত চিন্তাব ভারে ক্লিষ্ট কখনো বা চিন্তাল্পতার একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। কিন্তু ভাগ্য ভালো, সহসা তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে ড্যাফোডিলের ছবি, আর এই তাঁর নিভৃতের আনন্দ। কবি সদানন্দ না হয়ে পারেন না। বসন্ত যখন এতোদূরে যে ভাণ্ডিকপাখিরাও (swallow) বেরোতে সাহস করে না তখন যে ফুলেরা সাহস ভবে বেরিয়ে এসে মার্চের অনিলে নিজেদেব মেলে ধরে তারা কী দ্রুত ম্লান হয়! কবির চোখে জল আসে তাদের যাবার তাড়া দেখে। দ্রুতপক্ষ সময়ের পালিয়ে যাওয়া, গুটি গুটি এগিয়ে আসা মরণ, হারিয়ে যাওয়া প্রেমাস্পদকে ভেবে কবির অন্তর রোদনভরা। 'এক সকালেব আয়তনটুকু গোলাপের জীবনকাল, এইটুকুই সে বাঁচে' (৪)। আছেন ভ্রান্ত আদর্শবাদী যিনি 'গোলাপের মধ্যে নলিনীর পুনর্জন্ম' (৫) দেখে কাঁদতে বসেন। আছেন নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়াসক্ত যিনি 'সদ্যোদ্ভিন্ন গোলাপকুঁড়ির মুখ-মদিরার' (৬) চিন্তায় বিভোর। আছেন ধার্মিক ধ্যানী, এই আশ্বস্ত আবার পরমুহূর্তে সন্দেহজর্জর, যাঁর বলিকুঞ্চিত হৃদয়, কোনো শুষ্ক মুহূর্তে ফোটার পালা শেষকরা ফুলের মতো পাতালে, শিকড়ের মাতৃক্রোড়ে অর্থাৎ শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাষায়, মূলকন্দে ফিরে যায়। এক-এক সময় স্থূলনলিনীরা এতো ঘন হ'য়ে জন্মায় যে কুমারীত্বের প্রতীক এই কুসুমেরা পচা আগাছার চেয়েও তীব্রতর দুর্গন্ধ বিস্তার করে। কখনো কখনো গোলাপ নিজেই রুগ্ন হ'য়ে পড়ে। অদৃশ্যকীট 'তোমার রক্তিম রভস শয্যা খুঁজে বের করে তার

গোপন কাম দিয়ে তোমাকে ধ্বংস করে।' কিন্তু কখনো কখনো যখন ইন্দ্রিয়ের দেহলিতে মালিন্যের লেশ থাকে না, তখন দেখতে পাই বন্যকুসুমে অমরাবতী নেমে এসেছে, তখন অসীমকে করামলকবৎ ধারণ করতে পারি। কখনো কালযাত্রায় পরিশ্রান্ত উরস্বতী সূর্যমুখী টেনিসনের ছায়াঘন কুঞ্জে আপনভারে অভিনম্রা হ'য়ে সমাধির দিকে আনতমুখে থাকতে থাকতে সহসা সেই হিরণ্ময় শাশ্বত লোকে নূতন এক অতিপ্রাকৃত জীবনে ফুটে ওঠে, যে নিত্যলোকে যাত্রাবসান হয় সমস্ত যাত্রীর। উদ্ভিদবিজ্ঞানী বলেন, তা বেশ! তারপর বর্ণনা করতে বসেন: 'হেলিয়ানথাস বা সূর্যমুখী বর্গে পঞ্চাশটা উপজাতি আছে; এদের বেশীরভাগ উত্তর আমেরিকার অধিবাসী, কয়েকটার বাস পেরুতে আর চিলিতে।' এরপর তিনি আরো একটুক্রো সংবাদ জুড়ে দেন এই বর্ণনায়: 'ইংলণ্ডের কোনো কোনো অংশে ময়লা ফেলা জমিতে শত শত সূর্যমুখী গাছের চাষ হয়, বীজ তৈরীর জন্যে।'

ছয়

বৈজ্ঞানিকেরা যে ভাবে গোষ্ঠীর কথ্য ভাষাকে পরিশুদ্ধ করে নেন, আর বেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার বিভিন্ন অবভাষার মধ্যে ভেদ প্রচুর কিন্তু এই অবভাষা নির্মাণের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রেই এক। বিভিন্ন বিজ্ঞানে নিয়মিত সরলীকরণের কারণও এক, এর পদ্ধতিও এক। এই পদ্ধতিতে বলে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত প্রত্যেক বাক্য দ্ব্যর্থহীনভাবে একমাত্র একটা তথ্যকেই প্রকাশ করবে।

পূর্বেই বলেছি সাহিত্যে কথ্যভাষাকে অন্যভাবে শুদ্ধ করা হয়। সাহিত্যশিল্পী তক্ষণিক (technical) অবভাষাকে পরিহার করে গোষ্ঠীর চল্‌তিভাষাকে গ্রহণ করেন। এই চল্‌তিভাষার ভাণ্ডার থেকে কথা বাছাই করে তাদের একটা অভূতপূর্ব রীতিতে সাজিয়ে সার্বজনিকভাষাকে এমন একটা ভিন্নতর বিশুদ্ধতর ভাষায় রূপান্তরিত করেন, যে ভাষার আশ্রয়ে অনির্বচনীয় একান্ত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা সম্ভব, যে ভাষায় অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করা সম্ভব আর, যে ভাষায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তলোক, কৃষ্টিরলোক, আন্তরলোক, বহির্লোক, প্রত্যক্ষ ও প্রতীকের লোক ইত্যাদি যে বহুলোকে মানুষ তার বহুচরতার নিয়তিতে বাস করতে, চলতে ফিরতে ও দিশাহারা হতে বাধ্য, সেইসব লোকে নিবদ্ধ মানবীয় অস্তিত্বের বিচিত্রগুণ ও তাৎপর্যকে সরাসরি হোক, ইঙ্গিতে হোক, জ্ঞাপন করা সম্ভব।

ব্যষ্টির অন্তর্মুখিনতার গূঢ়তায় কিংবা সমষ্টিগত পূর্ণতায়, রসের, বুদ্ধির ও চৈতন্যের ঊর্ধ্বতম লোকে, কিংবা প্রবৃত্তি ও শারীর

আয়তনের গহ্বনে জীবনের যে রূপ সেই রূপকে প্রকাশ করতে গোষ্ঠীর ভাষাকে নানাভাবে শোধিত করা হয়েছে। কখনো সূক্ষ্ম কৌশলে কখনো আশ্চর্য এবং অসামান্য ভাবে। এখন ভাষার শোধনকর্মের বিশেষ কয়েকটা সুস্পষ্ট উদাহরণের বিচার করা যাক।

সাত

তথাকথিত ব্যাপ্ত স্তরে আলোচনা আরম্ভ করা যাক। মনে করা যাক কোনো সাহিত্যশিল্পীর লক্ষ্য সমগ্র মানবিক অস্তিত্বের বহু-ব্যঞ্জনার প্রকাশ। এই বহুব্যঞ্জনাকে, এই বহ্বর্থকে প্রকাশ করার জন্যে কী ভাবে তাঁকে কাহিনী বা নাটক রচনা করতে হবে? এই প্রশ্নের একটা উত্তর সেক্‌সপীয়রের 'ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা।' এই নাটক শুধু যে একটা বিয়োগান্ত নাটক তাই নয়, এই নাটক মানবজীবনের বহু-অর্থের বৃহৎ মঞ্জুষা। এর মধ্যে পাই সারল্যে করুণ ও রম্যরস বিহ্বল ট্রয়লাসের চক্ষে জীবনের তাৎপর্য, শৌর্যবান আদর্শবাদী হেক্টরের কাছে জীবনের অর্থ, অভিজ্ঞতাপরিপক্ক উগ্র-বিষয়বুদ্ধি ইউলিসিসের দিক থেকে জীবনের স্বরূপ, সৌন্দর্য ও রতির স্বাতুবিশ্বে বিরাজমান হেলেন ও ক্রেসিডার কাছে জীবনের রূপ, স্থূলবুদ্ধি মাঝারি মানুষ নির্বোধ আজাক্স ও তারই মতো কুৎসিত অথচ বুদ্ধিতে উজ্জ্বলতর একিলিসের কাছে জীবনের পরমার্থ এবং সবশেষে শুধুমাত্র দ্বেষ চালিত, সর্বত্র কুৎসিতদর্শী, দু'পায়ে চলন্ত মৃত্যুর বিজ্ঞাপন সেই থেরসাইটিসের কাছে জীবনের মূল্য যার কাছে দেহমাত্রই পুরীষ আর প্রমেহ আর পচন!

টলষ্টয়রচিত 'ওয়র এণ্ড্ পীস' আমাদের প্রশ্নের আর এক উত্তর। অসংখ্য চরিত্রের জীবনায়ন ও মৃত্যুবরণের বিচিত্র কাহিনী এই রচনা। যে ইতিহাসের বিপুল আবর্তে এরা বিভ্রান্ত বিস্রস্ত সেই ইতিহাসের টলষ্টয়রচিত ভাষ্যকে আশ্রয় করে এই উপন্যাসের সীমায় প্রকট হয়েছে জীবনের ব্যক্ত, অব্যক্ত, ঐকান্তিক, সার্বজনিক সমস্ত তাৎপর্য, তার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম ভাবরূপ।

জীবনের জড়-অর্থ (objectivity) থেকে মনোময় অর্থে উত্তরণের সম্ভাবনা প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের গঠনে অনুস্যূত। চরিত্রের আচরণ বিবৃত হয় কখনো তার বাইরে থেকে, কখনো তার অভ্যন্তর থেকে, কখনো অপরের দৃষ্টির মুকুরে আবার কখনো তার নিজস্ব অনুভবের দর্পণে। এবার, অপ্রতিবেদ্য আত্মগত অভিজ্ঞতার বিষয়টা বিচার করা যাক। কল্পিত কাহিনীর সীমার মধ্যে দু'টো পরস্পরসংবাদী অন্তর্মুখি ভাবকে মিলিত করে কিংবা একদিকে অন্তর্মুখিনতা আর একদিকে অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক বিবাদী বাহ্য ঘটনা একত্রে সন্নিবিষ্ট করে এই অপ্রতিবেদ্যকে প্রকাশ করা হয়। যেমন অরণ্যে প্রেমাভিসারের পর এমা বোভারীর বর্ণনা : 'চারিদিক নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে বৃক্ষরাজি থেকে মাধুর্য ক্ষরিত হচ্ছে। হৃদপিণ্ডকে অনুভব করলেন। আবার তার স্পন্দন শুরু হয়েছে। অনুভব করলেন পিশিতের মধ্যে রক্তস্রোত ক্ষীর প্রবাহের মতো। তারপর, দূরে অরণ্যের ওপারে, অন্য এক পাহাড়ে, একটা অস্পষ্ট বিলম্বিত চীৎকার শুনতে পেলেন। এই নিস্তব্ধতায় তিনি অনুভব করলেন এই চীৎকার যেন তাঁর স্নায়ুজালের শেষ স্পন্দনগুলির সঙ্গে সুরের মতো মিশ্রিত হ'য়ে গেল। রুডলফ্ দুই ঠোঁটের মাঝখানে সিগার নিয়ে তার কলমকাটা ছুরিটা দিয়ে ছেঁড়া লাগাম দুটোর একটাকে সারাচ্ছে আপনমনে।'

অভিনিবেশকে অভিজ্ঞতার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়ার এই যে পদ্ধতি এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Moll Flanders উপন্যাসের কাহিনী যদিও উত্তম-পুরুষের নিজমুখের বর্ণনা তবুও তা বাইরে থেকে দেখা ঘটনার বিবৃতি। যথা : 'আমরা বসতে না বসতে সে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে চুমুতে চুমুতে আমাকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দিলে, তারপর ছুঁড়ে দিলে শয্যায়। আমরা দু'জনেই তখন বেশ তপ্ত। এই

সুযোগে সে আমাকে এমন উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করলে যার বর্ণনা শালীনতার বাইরে। অবশ্য সেই মুহূর্তে তার দাবিকে প্রত্যাখান করার শক্তি আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। সে দাবির মাত্রা যদি আরও বেশী হোতো তাহলেও না।' এই ধরনের বর্ণনায় একটা চমৎকার কলাসঙ্গত সহজভাব আছে।

অপরপক্ষে Candide উপন্যাসে এই কৌশলের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। Candide-এর একতরফা হিসেবী বাস্তবনিষ্ঠতা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানবচরিত্রের পাপাসক্ত নির্বুদ্ধিতা, তার উপহাস্য অথচ ন্যক্কারজনক খলতার উপর জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই একতরফা বাস্তবনিষ্ঠতায় ব্যক্তির ঐকান্তিক সমস্ত অনুভব সুপরিকল্পিতভাবে বর্জিত হয়েছে। লিসবন (Lisbon) ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য Coimbra বিশ্ববিদ্যালয় যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ভলটেয়ার তার বর্ণনা করেছেন ঃ

'তারা এই ভাবে সেজে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে। করুণ সুরে ধর্মোপদেশ চলছে, আর তা ক্ষান্ত হ'লে একঘেয়ে গোঙানির সুরে বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠছে। ক্যানডিড এগিয়ে চলেছে। সে যে গান করছে সেই গানের তালে তালে চাবুক পড়ছে তার গায়ে। বিস্কের লোকটা আর যে দুজন বসা খেতে চায়নি তাদের পোড়ানো হোলো। আর প্রথাবিরুদ্ধ হলেও পাঁগ্লোসকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হোলো। ঐ দিনই ধরিত্রী তুমুল নিনাদে আবার কেঁপে উঠল।' (৭)

আট

ভাষার বিন্যাসের স্তরে শোধনের প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা এবার তার তথাকথিত 'কোষ ও আণবিক স্তরে' অর্থাৎ অনুচ্ছেদ, বাক্য ও বাক্যাংশের শোধনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো। প্রধানতঃ এইসব স্তরেই সাহিত্যশিল্পী অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করেন এবং তাঁর ঐকান্তিক অভিজ্ঞতাকে সার্বজনিক রূপদান করেন। Emily Dickinson-এর লেখা 'বসন্তে একটা দীপ্তি আছে' (A light exists in spring) একটা দৃষ্টান্ত। এই কবিতার বিষয়বস্তু প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যপ্রকাশ (apocalypse) আর সেই এক নিমেষের দিব্যদর্শনের পরের গভীর বিষাদ।

দূরে, নির্জন পাহাড়ের মাথায়
দাঁড়িয়ে আছে একটা রঙ্
বিজ্ঞান যাকে ছুটে ধরতে পারে না
কিন্তু যার স্পর্শ লাগে মানুষের বোধে। (৮)

এই প্রকাশ ঈশ্বর আবির্ভাবের মতো। প্রকাশের পর, সহসা, 'নিঃশব্দে তার তিরোভাব ঘটে আর, আমরা পড়ে থাকি পিছে।'

এই হারানোর ক্ষতি
আমাদের সারকে দরিদ্র করে,
ঐশ্বরিক উপচার
হয়ে যায় বাণিজ্যের পণ্য! (৯)

এক্ষেত্রে সার্বজনিক কর্ম ও প্রত্যয়মূলক ধারণার জগৎ থেকে জীবনের বহু অর্থের কিছু কিছু প্রতীক যথা বাণিজ্য, ঐশ্বরিক উপচার ইত্যাদি

আশ্রয় করে ব্যক্তিগত অনুভবকে প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এছাড়াও অন্যভাবে কবি অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে পারেন ঃ

এত নিস্তব্ধ যে
ঝিঁঝিঁর স্বর
ভেদ করছে পাথরকেও। (১০)

বাসো'র (Basho)* এই "হাইকু"**তে একটা অনন্য ঘটনার অভিজ্ঞতাকে বাক্‌বদ্ধ করা হয়েছে। এই অনন্য ঘটনার রূপকে জগতের "তথতা"—Meister Eckhart-এর ভাষায় সৃষ্টির ভাগবত ভূমি—অসীমের গর্ভ থেকে সসীমকালে আবির্ভূত হয়েছে। এই অবর্ণনীয়কে জ্ঞাপন করার জন্য জাপানী কবি তাঁর বাণীকে এতদূর সূক্ষ্ম করেছেন যে তা প্রায় সঙ্গীতময় নৈঃশব্দ্যে পরিণত হয়েছে। এ সেই নৈঃশব্দ্য যে চরম নৈঃশব্দ্য শৈল থেকে শৈলের যে ব্যবধান সেই ব্যবধান ভরে থাকে এবং রহস্যময় ব্যঞ্জনায় (রহস্যময় হলেও সন্দেহাতীত !) পতঙ্গের নির্মন পুনরাবৃত্ত শব্দে এক প্রকারের অব্যয়ভাব বা বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য আরোপ করে দেয়।

পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে শুনি কবি Andrew Marvell বলছেন ঃ

সমস্ত সৃষ্টিকে নস্যাৎ করে দিই
শ্যামল ছায়ায় একটা শ্যামায়িত ভাবনায় ! (১১)

বাসো (Basho) এখানেই শুরু আর এইখানেই শেষ করতেন। অপর পক্ষে 'উদ্যানে' ("The Garden") কবিতায় লৌকিক সবুজের অলৌকিক সবুজ ভাবনায় পর্যবসান অনেক ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনামাত্র। মার্ভেল যে কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন সেই কাব্য-রীতিতে জীবনের বহ্বর্থের যে পরিসরটুকুতে হাইকু কবিরা কাজ করেছেন তার চেয়ে বৃহত্তর পরিসর ব্যবহৃত হোতো।

* Basho-জাপানী হাইকু কবি (১৬৪৩-১৬৯৪)
** Haiku-সতের সিলেবলের ক্ষুদ্রতম কবিতা।

নয়

রহস্যময় ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত করে যে প্রকাশ তার ঠিক বিপরীত মেরুতে আছে আর এক প্রকাশ পদ্ধতি। এই প্রকাশ 'আপ্ত শব্দে' (mot juste) সরাসরি প্রকাশ। সবচেয়ে উপযুক্ত বিশেষ্য, সঙ্গততম বিশেষণ ও সবচেয়ে উপযুক্ত ক্রিয়াপদ মনোনীত করে গোষ্ঠীর ভাষার প্রকাশশক্তিকে সমৃদ্ধতর করা যেতে পারে। এর একটা উদাহরণ : উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনে আমরা কী অনুভব করি ? মিল্‌টন এই অনুভূতির বর্ণনা করেছেন দুটো নামপদ ও দুটো বিশেষণ ব্যবহার করে। এ বর্ণনা বিশুদ্ধতায় একাধারে কাব্যময় ও বিজ্ঞানসিদ্ধ। কবি বলেছেন : 'জানার আনন্দের এমন শান্ত সংশয়হীনতা'। কিন্তু এই ধরনের আপ্ত বর্ণনার সামর্থ্যও সীমিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মাপা কয়েকটা কথা দিয়ে, অভিজ্ঞতার এক এক খণ্ডের সঙ্গে এক একটা কথার সাযুজ্য স্থাপন করে, আমাদের অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গতাকে তথা জীবনের তাৎপর্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই বিচিত্রকে একটা মাত্র আপ্ত কথা এমনকি একটা বাক্যাংশ বা বাক্যের সীমায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর বিশপ রোভেনিয়াস (Rovenius) কর্তৃক চয়ন করা মরমী সাহিত্য থেকে কয়েকটা কথা বা বাক্যাংশ এখানে উল্লেখ করছি। 'জ্বলন্ত স্বত্তান্তরণ (১২), সারাৎ সারে মিলন (১৩), অবশোষক উল্লাস (১৪), অগাধে গলন (১৫), দিব্য চূর্ণীকরণ (১৬), অসহ্য পরিমর্শ (১৭), অতিদিব্য অনুপ্রবেশ (১৮), আধ্যাত্মিক নির্লজ্জতা (১৯), অন্ত্র ও মজ্জার অভ্যন্তরে মাধ্যাহ্নিক মহাবলি (২০),' এই উদ্ভট শব্দগুলির

প্রত্যেকটার সাহায্যে (আমার প্রিয় বর্ণনা 'দিব্যচূর্ণীকরণ'!) কোনো না কোনো নিষ্কপট' এবং যথার্থ সত্যদ্রষ্টা আত্মা গোষ্ঠীর ভাষাকে একপ্রকারের আধা-বৈজ্ঞানিক অবভাষায় 'সংস্কৃত' করে, যোগীসুলভ বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে জ্ঞাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ধ্যানলব্ধ অভিজ্ঞতা কিন্তু এতো ব্যক্তিগত এবং আর একদিকে এতো বিপুল যে এই অভিজ্ঞতাকে বিশেষ কোনো শব্দের সীমায়, একটা ভাবের বদলে একটা মাত্র কথা প্রয়োগ করে, প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এসব অনুভবকে যদি প্রকাশ করতেই হয় তাহলে তা করতে হবে পরোক্ষভাবে। হয় Crashaw ব্যবহৃত 'মধুরঘাতী তীর' এই ধরনের বিরোধাভাসযুক্ত (paradoxical) পদসমষ্টি দিয়ে কিংবা St. John of the Cross-এর 'সুখস্পর্শ দাহ, সুখাবহ ব্রণ' (২১) ইত্যাদি বর্ণনা দিয়ে কিংবা দর্শন ও ভাগবত তত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব মিশিয়ে প্রকাশ করতে হবে। তাই Suso বলেছেন: 'যোগীরা প্রত্যক্ষ এবং অতি অন্তরঙ্গভাবে এমন এক আলোকে অনুভব করেন যে আলোকে মনের মৃত্যু ঘটে, তার ব্যষ্টিভাব বিলুপ্ত হয় ও তা এক অবিকৃত ও উদার ঐক্যে বিলীন হয়।' যোগী যখন তাঁর ভগবদ্ প্রেমের কথা প্রচার করেন তখন আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সঠিক কেমন সেই প্রেমের প্রকৃতি? Meister Eckhart বলেছেন: 'যোগী ঈশ্বরকে ভজনা করেন অনীশ্বর, অনাত্ম, অ-পুরুষ, অ-প্রতিমরূপে। ঈশ্বর শুদ্ধ, অবিকৃত, কৈবল্য রূপী। এই কৈবল্যে নিমজ্জন শূন্যতা থেকে শূন্যতায় ক্রমনিমজ্জন। এ ছাড়া অন্যপথ নাই।'

দশ

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ-মিলনের চেয়ে কোনো অংশে কম অগাধ নয় মানুষী-দয়িতের সঙ্গে যৌনমিলন। যদিও এই মিলনের রভস দু পক্ষের মধ্যে বণ্টিত তবু্ও ঈশ্বরমিলন অনুভবের সমগোত্রীয় এই মিলনঅনুভব তার চেয়ে কম অনির্বচনীয় নয়। যোগীর পক্ষে-ঈশ্বরমিলনের অনুভব জ্ঞাপন যতটা দুরূহ সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে শৃঙ্গার অনুভূতি জ্ঞাপন তার চেয়েও দুরূহ। তাঁর প্রথম সমস্যা এই বর্ণনায় কী উপায় তিনি ব্যবহার করবেন? বৈজ্ঞানিক অবভাষা না ভাবময় ভাষা? ভদ্রজনোচিত বক্রইঙ্গিতময় ভাষায় কিংবা অধ্যাত্ম অনুভবের উপমা প্রয়োগ করে কিংবা দার্শনিক বাগ্মিতায়? আপ্তশব্দ ব্যবহার করে কিংবা সবশেষে স্থূল কথায় অর্থাৎ য়্যাংগ্লোস্যাক্সন ভাষার একটা চতুরক্ষর কথায়? লরেন্স (Lawrence) যখন তাঁর লেডি চ্যাটার্লী (Lady Chatterley) পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আমাকে প্রথম পড়ে শোনান তখন ঠিক এই সব প্রশ্ন নিয়েই আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। লরেন্সের মতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিবেচনার অযোগ্য। তেমনি অযোগ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের বক্র বর্ণনা।

বৈঠকী বাৎসায়নেরা শিষ্টসমাজের মহিলাদের গণ্ডে লজ্জার রক্তিমা উদ্রেক না করে ছোটো ছোটো ক্ষণিকমৃত্যু, ভ্রাম্যমাণ অঙ্গুলি এবং দিগ্‌ভ্রান্ত ওষ্ঠাধর, দ্বারে দ্বারে অসহিষ্ণু করাঘাতরত রতিসুখ, দেহমন্দির দেহলীতে পৌঁছেই বিফল মনোরথ প্রণয়ীর ব্যর্থকাম মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারের বর্ণনায় অতিকেতাদুরস্ত প্রায় বীজগাণিতিক যে কৌশল প্রয়োগ করতেন লরেন্স সেই কৌশলকে অতি অশ্লীল

বলে মনে করতেন। 'প্রেমের যথার্থ লক্ষ্যকে' অলীক রসার্দ্রতায় অপার্থিবরূপে চিহ্নিত করাকেও তিনি সমান অশ্লীল মনে করতেন। চিত্তাশ্রিত কাম চিন্তাশ্রিত কামের মতোই লরেন্সের জুগুপ্সা উৎপাদন করতো। রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রয়োগে রতি বর্ণনায় তিনি যেমন বিতৃষ্ণ ছিলেন, তেমনি বিতৃষ্ণ ছিলেন সুরত অভিজ্ঞতার গণিকালয়ের ভাষায় পিচ্ছিল বর্ণনার প্রতি। লরেন্সের মতে খাঁটি শৃঙ্গার অভিজ্ঞতার একটাই মাত্র খাঁটি বর্ণনার রীতি আছে। এই রীতি—আপোষহীনভাবে দ্ব্যর্থহীন, ইংরেজী ভাষার কয়েকটা চতুরক্ষরের ওপর দৃঢ় নোঙ্গর করা নভোচারী কাব্যের উচ্ছ্বাস। তত্ত্বের দিক থেকে এই সমস্যা সমাধানের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে হয়। কিন্তু কার্যতঃ, বিশেষ করে ইতিহাসের এইক্ষণে আমাদের এই বিশিষ্ট কৃষ্টির বাতাবরণে, এই পদ্ধতিরও ত্রুটি আছে। এই চতুরক্ষর কথাগুলি এখনো ট্যাবু অর্থাৎ সংস্কার-নিষিদ্ধ কথা। তাই তাদের বারংবার প্রয়োগে পাঠকচিত্তে যে ভাব সঞ্চারিত হয় সেই ভাবের প্রাবল্যের মাত্রা এই চতুরক্ষর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি-জনিত যে গুরুত্ব তাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়।

ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিক কখনো 'আঁতুর ঘরে নব আগন্তুকের' আবির্ভাবের বিশদ বিবরণ দিতেন না; মধুচন্দ্রিকার দিনে ভুলেও কখনো Krafft-Ebing-এর যৌনবিকৃতির বিবরণ উল্লেখ করতেন না। ফলে, তাঁদের রচনা 'জীবনের ভাষ্য' হিসেবে একেবারেই অবাস্তব থেকে যেতো। কিন্তু যখন সমসাময়িক ঔপন্যাসিকেরা কামজ ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন পর্যায়কে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনার প্রয়াস পান যাদের আমরা এতাবৎকাল মুদ্রণের অনুপযুক্ত ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তখনো কিন্তু 'জীবনের ভাষ্য' একদিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের ফলে 'কাৎ' হয়ে সমানভাবেই অবাস্তব থেকে যায়। যখন ইংরেজী চতুরক্ষর কথা

বা বাংলায় দ্ব্যক্ষর কথা ব্যবহৃত হয় তখন স্থূরতব্যাপারের বর্ণনার গুরুত্ব তার স্বাভাবিক গুরুত্বের ত্রিঘাতি মাত্রা অর্জন করে। পাঁচ পৃষ্ঠা একশো পঁচিশ পৃষ্ঠার (পাঁচের ত্রিঘাত) গুরুত্ব অর্জন করে। ফলে সমগ্র রচনার ভারসাম্যটাই বিনষ্ট হয় এবং তার গঠনটা এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যে তাকে আর চেনাই যায় না। বোধকরি, অষ্টাদশ শতাব্দীর আভাসে ইঙ্গিতে বর্ণনার পক্ষে, লরেন্স যতটুকু মানতে রাজী হয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে বেশী যুক্তি আছে।

এগার

'স্থূলবর্ণনা' এবং 'সূক্ষ্মবর্ণনা'র আলোচনা ছেড়ে এবার আমরা পরোক্ষ এবং মূলতঃ কাব্যধর্মী উপমাশ্রিত বর্ণনার প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। "ঐ ক্ষীর নিঃস্যন্দী তীক্ষ্ণ কুচাগ্র বাতায়নের লৌহজালের অন্তরাল থেকে পুরুষের নয়নকে বিদ্ধ করে" কিংবা "কঠিনতম সংকল্প রক্তের আগুনে সমিধের মতো পুড়ে ভস্মসাৎ হয়" ইত্যাদি উপমাশ্রয়ী বর্ণনা বহু অর্থ বিচ্ছুরণ করে।

সমিধে বহ্নির উপমা, লৌহজালের অপরদিকে একজোড়া বেধনিকার মতো দুই কুচাগ্র, ইত্যাদি উপমা একটা অতি-অসম শক্তির সঙ্গে সংঘাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সংঘাত সমাজের নিগ্রহের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানসের প্রবৃত্তির সংগ্রাম। এই সংঘাত বিবেকের প্রাচীরে কামনার উন্মত্ত আক্রমণ, যে বিবেক সমাজের বেশীর ভাগ মানুষকে বেশীর ভাগ সময় কাপুরুষ করে রাখে, তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিষ্ট সভ্য করে রাখে।

যুক্তি চালিত হোক বা আবেগ চালিত হোক, অধঃপতিত হোক বা মুক্তপুরুষই হোক মানুষ কখনো সর্বতো পরিব্যাপ্ত নশ্বরতা এবং দুর্নিরোধ্য কালপ্রবাহের সত্যকে ভুলতে পারে না। সাহিত্যের পরিশুদ্ধ ভাষার পক্ষযুক্ত রথ, ম্লানায়মান প্রসূন, লবিত্র বা হোরাযন্ত্র ইত্যাদি বাক্‌প্রতিমা এই প্রতিনিয়ত মরণশীল জগতে মগ্ন যে অস্তিত্ব তার অসংখ্য দ্যোতনাকে প্রকাশ করে। যে বহুব্যঞ্জনাময় বাক্‌প্রতিমা দিয়ে লামার্তিন (Lamartine) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা আরম্ভ করেছেন সেই বাক্‌প্রতিমা এর একটা দৃষ্টান্ত।

এমনি ক'রে প্রত্যহ ঠেলে চলেছি
নতুন কূলের দিকে
চিরন্তনী সেই রাত্রির যাত্রায়
যে যাত্রায় ফিরে আসা নাই।
যুগযুগান্তের এই সমুদ্রে
একদিনের জন্যও কি নোঙ্গর ফেলতে পারবো ? (২২)

পরের কবিতায় পোতের উপমার পরিবর্তে মাকুর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। Henry Vaughan মানুষের দশা বর্ণনা করেছেন :

মানুষ এক মাকু,
এই সব তাঁতের মধ্যে তার অবিশ্রান্ত যাতায়াতে
আর ঘুরন্ত সন্ধানে
ঈশ্বর গতি দিয়েছেন
কিন্তু যতি দেন নি। (২৩)

এই উপমা থেকে নানা শাখাপ্রশাখায় রূপকের মালা তৈরী হয়েছে। সদাতাড়িত এই মাকুরা কী তন্তু বুনছে নিরবচ্ছিন্নভাবে ? কীই বা গুণ এই অংশুকের ? আর এই তন্তুবায়দের কী একদিনের জন্যও বিশ্রাম নাই ?

উপমার সাহায্যে আমরা একটা বিষয়ের বর্ণনায় বিষয়ান্তরকে আশ্রয় করতে পারি আর তার ফলে জীবনের বাহ্য ও আভ্যন্তর আরো বহু অর্থকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করতে পারি যাদের ঋজু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সাহিত্যে ব্যবহৃত সংকেতের কার্যকারিতাও উপমারই মতো।

ইংলণ্ডের বহু অভিজাত, সরস্বতীর চেয়ে
উজ্জ্বলতর সুরা পরিস্রাবণ করতে পারেন ;

আর মানুষের কাছে ঈশ্বরের লীলাকে বেশী ক'রে
প্রতিপন্ন করতে পারে সুরামণ্ড
মহামতি মিলটনের চেয়েও। (২৪)

কোন্‌টা শ্রেয়? ভাগবত তত্ত্বের যুক্তি কিংবা দেহ রসায়নের পরিবর্তন? উচ্চাঙ্গদর্শন না আরও ভিটামিন? মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিয়োপী (Calliope) ও গীতিকাব্যের দেবী পলিহিমনিয়া (Polyhymnia) এঁদের প্রেরণা না 'বৃদ্ধ মার্জারকে প্রগল্‌ভ করে তোলা সাক্‌সন সুরাপাত্রের আসব?' হাউসম্যানের (Housman) চারটে পঙ্‌ক্তিকে ভাষ্যে ভাষ্যে বিস্তীর্ণ করে বৈজ্ঞানিক তথ্যের, চিকিৎসা শাস্ত্রেব রোগবিবরণীর, দার্শনিক স্বগতোক্তির এবং নীতিবিচারের বিপুলকায় বহু গ্রন্থে পরিবর্ধিত করা যায়। আবার, যখন আগেকার দিনের কোনো কবি দেবতুল্য ডেভিড্‌-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন:

তিনি তাঁর স্রষ্টার আত্মরূপ প্রতিচ্ছবিকে নিজের শাসনের মতো দেশময় ছড়িয়ে দিলেন! (২৫)

তখন দ্বিতীয় চার্লস-এর কাল ও তাঁর শয্যাকেন্দ্রিক বীরত্বের পটভূমিকায় খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মৌলিক খ্রীষ্টীয় নৃতত্ত্বের এই উল্লেখ যে হাস্যরসের উদ্রেক করে তার তুলনা মেলা ভার! ড্রাইডেন (Dryden)-এর Absalom ও Achitophel থেকে এই উদ্ধৃতির পরে এবার আমরা একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবির রচনার দিকে দৃষ্টি দেবো। সাহিত্যিক সংকেতকে (উদ্ধৃতি ও ব্যঙ্গানুকৃতিসহ) T.S. Eliot তাঁর Wasteland কবিতায় জীবনের বহু অর্থ প্রকাশ করার কাজে ব্যবহার করেছেন। মলিন ও মেধ্য, পরিশীলিত সূক্ষ্মতম অনুভূতি আর বিবমিষাজনক কুৎসিত, বুদ্ধির তীব্র ঔজ্জ্বল্য আর প্রায় অগাধ নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি বিপরীত দ্বন্দ্বের প্রতি এই মানুষ নামক জীবের সমান আকর্ষণীকে তিনি প্রকাশ

করেছেন বিংশশতাব্দীর উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে গ্রীক লাতিন, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক সাহিত্য থেকে চয়ন করা অনুষঙ্গ (allusion), উদ্ধৃতি বা হাস্যানুকৃতি (parody) একত্রে মিশিয়ে।

সাহিত্য-শিল্পীরা গোষ্ঠীভাষার শুদ্ধীকরণ তথা সমৃদ্ধকরণের অবিরত প্রচেষ্টায় আরও অনেক উপায়ের শরণ নেন। এইসব উপায় চৈতন্য আর শারীর অস্তিত্বের মাঝখানে যে অস্ফুট অঞ্চল সেই অঞ্চলটিতে সক্রিয় ব'লে এদের অনেক সময় 'মায়িক' (magical) বলা হয়।

অপরিচিত সুন্দর পদান্বয় কিংবা বাক্য এমনি 'মায়িক'। যে সব নাম বা শব্দ কোনো নিগূঢ় কারণে স্বয়ংসার্থক বলে প্রতীত তারাও এমনি মায়িক। এমনি মায়িক সুসজ্জিত ছন্দ এবং ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের শ্রুতিমধুর সংচয়ন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এমনি সব মনোহরণ পদবন্ধ : যেমন— ইংরেজীতে, 'আমাকে না চিনে তোমরা নিজেদের অচেনা বলে প্রমাণ করেছো' কিংবা ফরাসীতে, 'নিত্যকাল তাকে বদলায় যেমন সে বদলায় নিজের মধ্যে' (২৬)। অন্যদিকে পাই সহজ বাক্যাংশের মোহময় একত্র সমাবেশ : 'ওর মুখ ঢাকো, (ওই মুখ দেখে) আমার দুচোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে : বড় অল্প বয়সে মরেছে ও।' কিংবা 'আমার ঘুম যেই ভাঙল অমনি সে মিলিয়ে গেল, দিন ফিরিয়ে আনলে আমার রাত্রিকে' কিংবা 'রাজকুমারী ভলুপিনি এলো ; কিছুক্ষণ একত্র হলো দুজন ; তারপর, তার শেষ।'

অন্বয়ের ইন্দ্রজালের আশ্চর্য শিল্পী মিলটন (Milton) ও মালার্মে (Mallarme)। Paradise Lost যেন অন্বয়ের অমরাবতীর পুনরুদ্ধার, শুধু পুনরুদ্ধার নয়, সম্পূর্ণ নবায়ন। মালার্মে শেখালেন : 'ধূসর সাহিত্যকে মুছে দাও' (২৭)। যে-সব কথা রূঢ় বাস্তবের ইঙ্গিত বহন করে সেই-সব কথাকে সাহিত্য থেকে উড়িয়ে দাও। শুধু

শব্দের ওপর এবং বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যে শব্দের অন্বয়ের ওপর মনকে নিবিড় করো।' তাঁর প্রচারিত তত্ত্বকে স্বয়ং প্রয়োগ করে মালার্মে তাঁর সনেটে পদসজ্জার এমন সব বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন যার কোনো তুলনা নাই আধুনিক সাহিত্যে।

তের

যে সব কথা ও নাম স্বভাবতঃ স্বয়ংসার্থক তারা কোনো কোনো প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ সুপ্রযুক্ত। কিন্তু তাদের সুপ্রয়োগের প্রকৃতি 'আপ্ত শব্দে'র সুপ্রয়োগের প্রকৃতি থেকে আলাদা। 'আপ্ত শব্দ' সরাসরি এবং প্রায় বৈজ্ঞানিক অর্থে অর্থবান। অপর পক্ষে স্বয়ংসার্থক কথা বা নাম নিত্যসিদ্ধ অর্থে অর্থবান কারণ তারা শ্রুতিমধুর এবং কোনো না কোনো কারণে নিজের দ্যোতনার অতীত কোনো অভিজ্ঞতা-লোকের ব্যঞ্জনায় দীপ্ত। তাই 'মিনোস আর পাসিফি-র (Minos ও Pasiphae) পুত্রী' এই ছোট্ট পঙ্‌ক্তিটি ফ্লবেরের (Flaubert) কাছে ফরাসী ভাষায় সবচেয়ে সুন্দর পঙ্‌ক্তি, অক্ষয় ও অতীন্দ্রিয় মনোরমতায় অতুলনীয়। হোমার থেকে মিলটন সমস্ত মহাকবির মহাকাব্য নানা নামের গাম্ভীর্যে মন্দ্রিত। পিওর (Peor) ও বালিম (Baalim); আর্গব (Argob) ও বাস্‌না (Basna); আব্বানা (Abbana) ও ফার্ফার (Pharphar) এই নামগুলি স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীর মতো ধ্বনিময়। অন্যত্র পাই, আরও নিম্ন-গ্রামে উচ্চারিত মোহময় শব্দসম্পদে ঋজু পদবন্ধ :

'বল্লক হিথে বালক টেমসকে পেরিয়ে' কিংবা 'আমিন্তস (Amyntas) এখন সিফামোর গাছের ছায়ায় তার ক্লরিস (Chloris)-এর সঙ্গে সুপ্তিমগ্ন'। সিফামোর বা বাংলায় তমাল, এমন একটা স্বয়ংসার্থক কথা যা তার অর্থব্যাপ্তি দিয়ে কোনো কাল্পনিক গোষ্ঠে ক্লরিস ও তার রাখালপ্রিয়ের প্রেমলীলার দ্যোতনা বহন করে। আরও উচ্চতর দ্যোতনার স্তরে বিরাজ করে শেক্‌স-পীয়রের আশ্চর্য পদবন্ধ : 'অন্তিমের গান' (defunctive

music) ‘একমাত্র এক আরব পাদপ’, ‘রক্তবর্ণ ভূয়িষ্ঠ সমুদ্র’ (multitudinous seas incornadine)। তেমনি, মিলটনের পদবন্ধঃ ‘অট্টায়িত গজ’ কিংবা ‘সুচিক্কণা পানোপি’ কিংবা, ‘দ্বারদেশে দ্বিভুজযন্ত্র’। আরও একটা উদাহরণ Christopher Smart-এর Nativity of our Lord কবিতার তিনটি স্তবক। এই কয়েকটা স্তবকে সুষম শব্দ গাম্ভীর্যের ইন্দ্রজালের সঙ্গে স্বয়ংসার্থক নামের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে ঃ

‘কোথায় এই আশ্চর্য অচিন অতিথি !
সলিমার (Solymar) প্রবীণ জন তোমরা বলে দাও,
আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো
যেখানে প্রভু আবির্ভূত হয়েছেন
পশুর ভোজ্যপাত্রে,
জনশূন্য সৈকতে উত্তর মারুৎ
তার শীতযাপন সাঙ্গ করেছে
প্রভঞ্জন বিরত হ’য়েছে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে
ওক বৃক্ষের কাণ্ড ভাঙার উপদ্রব থেকে,
কোকিল আর কারণ্ডব
গানে গানে ঘোষণা করছে তাদের প্রভুর আবির্ভাব,
ভাগ্যবন্ত কণ্টকগুল্মে অকালে আবির্ভূত হ’য়েছে
শুভ্রের চেয়েও শুভ্র প্রসূন ! (২৮)

জীবনের যে সব শান্ত মুহূর্তগুলিতে স্মার্ট (Smart) অত্যধিক চিত্তবিক্ষেপ থেকে কিংবা পরিবেশের সঙ্গে আত্যন্তিক সাযুজ্যবোধ থেকে বিমুক্ত ছিলেন এই কবিতা সেই সব শান্তমুহূর্তের কোনো একটিতে আবির্ভূত হয়েছে। যখনই তিনি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে অতিরিক্তভাবে মানিয়ে নিয়েছেন তখনই তাঁর প্রতিভা শৃঙ্খলিত হয়ে গেছে। আবার যখন তাঁর চিত্ত অতিরিক্ত বিভ্রান্ত

হয়েছে তখন তিনি নীচের এই উদ্ধৃতির মতো উদ্ভট রচনা করেছেন। 'ওনোক্রোটেলাস রাসভের মতো চীৎকার ক'রে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছে। এহুদ তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উল্লাস প্রকাশ করুক। কেননা এই রাসভ তার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে গানে মেতেছে।' (২৯)

'আমি ভগবানকে আশীর্বাদ করছি তার কারণ যে বীজ থেকে এহুদ, মুটিয়াস, স্কিভোলা আব কর্ণেল ড্রেপার উৎপন্ন হয়েছেন সেই বীজ থেকে উৎপন্ন আমিও।' (২৯) মস্তিষ্ক বিকৃতির ফাঁকে ফাঁকে (এবং এটা আমাদেব সৌভাগ্য), উন্মত্ত অবস্থার পূর্বের মানস প্রদোষে তিনি চৈতন্যের বিচিত্র স্ফূর্তি লাভ করতেন, আর চৈতন্যের এই স্ফূর্তিতে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক কৃষ্টির কারাগার থেকে মুক্তি লাভ ক'রে একই সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভাকে সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দিতে পেরেছেন এবং রচনার মধ্যে বুদ্ধির শৃঙ্খলাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। তাঁর Nativity এবং A Song to David এই দুটি কবিতায় তিনি নিজেকে ধ্বনি, পদান্বয়, উপমা, প্রতীক ইত্যাদি যে সব ইন্দ্রজালে ভাষা মার্জিত হয় সেই সব আধারের আশ্চর্য শিল্পী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আর কথার দুঃসাহসিক প্রয়োগ থেকে যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি সেই ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন রচনার বাকী সব উপাদানে। কথার প্রয়োগে কিছু না কিছু পরিমাণের দুঃসাহসিকতা মহৎ কবিতার লক্ষণ। এমন কবি আছেন যাঁরা এ ব্যাপারে অতি সামান্য পরিমাণে দুঃসাহসিক হয়েও মহৎ কবি; আবার অনেক মহৎ কবি সময়ে সময়ে নিরঙ্কুশভাবে দুঃসাহসিক।

> "আমরা এতে নাড়া খাই না।
> এর চেয়ে বরং হে মহেশ্বর,
> পর্যুসিত কোনো বিশ্বাসের স্তন্যেতে লালিত
> প্রকৃতি-দেব কোনো ম্লেচ্ছ হওয়া শ্রেয়।

যেন এই মনোহরণ শাদ্বলে দাঁড়িয়ে
এমন সব আভাস পাই
যাতে আমার একাকীত্বের অবসান ঘটে।
যেন ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপী প্রোতিয়ুসকে উঠতে দেখি
সমুদ্র থেকে,
কিংবা শুনি সেই রব
যে রব বেজে ওঠে
সমুদ্র-দেব ত্রিতনের ফুলমালা ঘেরা বিষাণে! (৩০)

খুব চমৎকার শব্দ প্রয়োগ কিন্তু ততটা দুঃসাহসিক নয়। Yeats -এর Byzantium কবিতার শেষ স্তবক আর একটা দৃষ্টান্ত।

সমুদ্র শুশুকের রক্তকর্দমাক্ত পিঠে
সওয়ার হয়ে চলেছে প্রেতের পর প্রেত!
স্রোত ভাঙছে নেহাইয়ের ওপর
রাজ রাজেশ্বরের সোনার কামার শালায়।
নাচঘরের মর্মরের মেঝে
ভেঙে হয় খান খান তিক্ত জটিল রোষে
একদল প্রতিবিম্ব জন্ম দেয়
নতুন আর একদলের,
ঐ শুশুকে বিধ্বস্ত
কাংস্য রব তাড়িত সমুদ্র। (৩১)

এই দৃষ্টান্তে শব্দের দুঃসাহসিক প্রয়োগে কবি আশ্চর্যভাবে বল্গাহীন। Yeats প্রচলিত ভাষার কথাগুলিকে তাদের পরিচিত অভিধানসিদ্ধ অর্থের শৃঙ্খল থেকে পরিমুক্ত করেছেন, তাদের অন্বয় ও বিধিসম্মত পারম্পর্যকে ভেঙেছেন।

এই একান্ত ব্যক্তিগত ভাষা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন :

কোনো এক সবুজ ডানার আবেগে
আমি অর্ধ উন্মাদ হয়েছি,
অর্ধ উন্মাদ হয়ে কুড়িয়েছি গম
নিরাকাব মূঢ় অন্ধকাবে
পুবাণো মমীব মধ্যে,
তারপব সেই গোধূমেব বীজগুলিকে
পিষেছি পিষেছি পিষেছি
ধীবে ধীবে সেঁকেছি চুল্লীতে,
কিন্তু, এই দেখো এখন এনেছি
পূর্ণস্বাদ পূর্ণগন্ধ সুবাসাব
এক বিচিত্র কণ্ঠোল থেকে !
এ কণ্ঠোল পেয়েছি খুঁজে
সেই মুগ্ধ বাটে যেথা
এফিসাসেব (Ephesus) সপ্ত সোমপা
এমন ঘুম ঘুমিয়েছিল যে তারা টেব পায়নি
কখন বিলুপ্ত হলো
সেকেন্দাবের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। (৩২)

এই কণ্ঠোল বা 'ব্যাবেল' কবিব সজ্ঞানমনের ঠিক নীচেকার মানস স্তর (preconscious)। শব্দের দুর্দম উচ্ছ্বাসে এ স্তর উপরে আবির্ভূত হয়েছে এবং ব্যবহারসিদ্ধ (conventional) ভাষাকে মুক্তি দিয়েছে উদ্দামতব প্রমাদ-নির্ভয় মত্ততায় !

চৌদ্দ

Rimbaud র‍্যাঁবো পল ডেমেনিকে (Paul Demeny) লিখিত তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে ভাষা প্রয়োগে দুঃসাহসিকতার একটা তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন আভিধানিক অর্থ মৃতদের জন্য, যাদের চেতনা শিলীভূত তাদের জন্য, এক কথায় আকাদামী বা বিদ্বৎপরিষদের পণ্ডিতদের জন্য। প্রত্যেক শব্দ একটা আইডিয়া বা মানসিক রূপরেখা। আমার অনুমান তিনি এই বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে যখন কোনো শব্দকে অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তার অন্বয়জাত অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তখন সেই শব্দ একটি নতুন অনিশ্চয় ও রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য অর্জন করে। তখন সেই কথা আর মানসিক রূপরেখা বা আইডিয়া থাকে না, তখন তা একটি 'বদ্ধমূল ধারণায়' পরিণত হয় অর্থাৎ তখন তা প্রহেলিকার মতো বারংবার স্মৃতিপথে উদিত হয়। টেনিসন (Tennyson) উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষ নিজের নাম বারংবার উচ্চারণ ক'রে নিজের পরিচিত সত্ত্বার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে। এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে মানুষ যখন একটা বিশেষ কথাকে বিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করে, তাকে চেনা কোনো বাক্যের অংশবিশেষ-রূপে না ভেবে তাকে তার স্বপ্রকৃতিতে, শব্দ ও অর্থের একটা স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিমারূপে গ্রহণ করে। এই আইডিয়া-রূপ বা মানসিক রূপরেখারূপ যে শব্দ সেই সব শব্দকে আশ্রয় ক'রে আগামীকালের কবিতার বিশ্বজনীন ভাষার সৃষ্টি হবে। এই ভাষা একাধারে সৌরভ, ঝঙ্কার, বর্ণ এবং চিন্তার আড়ালের সেই সত্তা যা

চিন্তাকে বিঁধে তাকে নিজের দিকে টেনে আনে এই সবকিছুকে একাধারে প্রকাশ করবে।

কবির সাধনা দ্রষ্টার সাধনা। দ্রষ্টা কবির ধর্ম ঃ অজ্ঞাতের ঠিক যে অংশটুকু তাঁর জীবিতকালে বিশ্বআত্মার আধারে গোচরীভূত হলো সেই অংশটুকুর রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করা। নিরঙ্কুশভাবে প্রযুক্ত শব্দ এই অজ্ঞাতের দিকে যে গবাক্ষ তাকে উন্মুক্ত করে। মানসছবিরূপ বা আইডিয়ারূপ মুক্ত শব্দ যথেচ্ছ প্রয়োগ ক'রে কবি এমন সংবেদনকে সম্ভব ক'রে তুলতে পারেন যা অদ্যাবধি অলীক কিংবা অপরিচিত। এই ভাবে অস্তিত্বের সেই মৌলিক রহস্যকে আবিষ্কার করতে পারেন যাকে অন্য কোনো ভাবে উদ্ধার করা যেতো না সেই ;

> 'অসংখ্য রূপময় অতল থেকে
> যে অতলে গুপ্ততত্ত্ব লীন থাকে
> আপন আনন্দে
> প্রজ্ঞা যেথা গুপ্ত রাখে আপন নৈপুণ্য।' (৩৩)

ডাডা (Dada) আন্দোলনের প্রবর্তকরা শব্দ প্রয়োগে চরম ও সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশতার পক্ষে প্রচার করেছেন। 'ডাডা' মতের পরিপোষক একটা প্রবন্ধে আঁন্দ্রে জিদ (Andre Gide) 'ডাডা' দর্শনের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ 'প্রত্যেকটা শিল্পশৈলী যেন নিয়ম সূত্রে পরিণত হয়ে গেছে এবং এদের প্রত্যেকটা অসহনীয়, ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। প্রচলিত পদান্বয় রীতি এমন বিরস হয়ে গেছে যে তা চিত্তকে বিস্বাদ করে তোলে। বিগত দিনের শিল্পশৈলী আর বিগত দিনের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ তাদের অনুকরণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া। যা পরমবস্তু তাকে আর পুনঃসৃজিত

করা যায় না। আমাদের ভাষার সে প্রাসাদ, তার ভিত্তি এমন ফোঁপড়া হয়ে গেছে যে তার মধ্যে চিন্তার নূতন আবাস রচনার প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করতে পারি নে। এর সংস্কার সাধন করা দূরে থাক, যে অংশ আপাতদৃষ্টে এখনো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভাণ করছে সেই অংশগুলোকে আগে ভেঙে ফেলতে হবে। যৌক্তিকতার ছাঁদে এখনো যে সব কথা একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে রয়েছে তাদের পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আলাদা করে ফেলতে হবে।···

···রচনার পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটা শব্দদ্বীপের সীমানা স্পষ্ট করে টানতে হবে, তাকে একটা শুদ্ধ স্বরের মতো এক জায়গায় বসাতে হবে। তার অনতিদূরে অন্যান্য শুদ্ধ স্বরেরা স্পন্দিত হবে কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে না এমন কোনো বন্ধন যার ফলে বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ কোনো ভাবসংস্রব ঘটতে পারে। এইভাবে প্রত্যেকটা কথা ভূতপূর্ব সমস্ত অর্থ থেকে বা সংকেত থেকে বিমুক্ত হবে।' বলা বাহুল্য যে ডাডাপন্থীদের পক্ষে তাঁদের প্রচারিত মতবাদকে মনস্তত্ত্বের এমনকি শারীরতত্ত্বের দিক থেকে নিয়মিতভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভবও ছিল না। তাঁরা যাই করুন না কেন, কোনো না কোনো অর্থ, কোনো না কোনো তর্কশাস্ত্রানুগ ব্যাকরণসিদ্ধ ভাবসংস্রবজাত উপপত্তি অজ্ঞাতসারে প্রকট হয়ে পড়তে লাগল। মানুষ যেহেতু জৈবধর্মানুসারে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে প্রেরিত জীবমাত্র, মানুষ যেহেতু স্বভাবধর্মে কোনো একটা বিশেষ স্থানে বা ইতিহাসের বিশেষ একটা কালে আবদ্ধ মানুষ, সেই হেতু ডাডাপন্থীরা তাদের তত্ত্বের নির্বন্ধে যতটা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী সুশৃঙ্খল হতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের চিন্তায় ও অনুভবে, বাধ্য হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাকরণ-বাধ্য ও অনেক বেশী যুক্তিনিষ্ঠ হতে।

সাহিত্যিক আন্দোলন হিসেবে 'ডাডা' আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও শব্দব্যবহারে নিরঙ্কুশতার তত্ত্বকে তারা যুক্তির শেষ সীমা তথা যুক্তিহীনতার চরম পর্যায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে কবিতা ও সমালোচনা সাহিত্যের উপকারই করেছেন। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সবচেয়ে বড় গুণ শব্দপ্রয়োগে অবধানতা। তাঁর ব্যবহৃত প্রত্যেকটা কথা বিশেষকোনোশ্রেণীভুক্ত তথ্য বা ধারণাপরম্পরার সঙ্গে অন্যোন্যসম্পর্কে সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক বিচারের রীতি অনুসারে তিনি একাধিক বিষয়কে একসঙ্গে জ্ঞাপন করতে পারেন না। একটা কথায় বহু অর্থ আরোপ করতে পারেন না। যুক্তি-আশ্রয়ী বিচারের গণ্ডীর বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি সার্বজনিক পর্যবেক্ষণ ও সার্বজনিক যুক্তির ক্ষেত্রে অনুসন্ধানরত। এই অনুসন্ধান সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব বর্ণন তাঁর পক্ষে বিধিবহির্ভূত। অপর পক্ষে কবিরা এবং সাধারণভাবে সাহিত্যিকরা, তাঁদের নিজস্ব নর্মবিধি-দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ তাহাই তাঁদের লক্ষ্য। যদিও বিশেষ উপলক্ষ্যে কবি সাহিত্যিকদেরও কথাপ্রয়োগে অবহিত হতে হয়, তবু অন্য উপলক্ষ্যে শব্দপ্রয়োগে অনবধানতা, প্রয়োজন হলে দুঃসাহসিকতম অনবধানতাও কবিধর্মের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। একপ্রকার সনাতন মননবর্গের বা বিবেকের অনতিক্রম্য বিধান (Categorical imperative) হয়ে দাঁড়ায়।

পনর

কবিজনোচিত সংবেদ সুলভ, কিন্তু কাব্যধর্মী অন্তর্ভাবনার বহিঃ-প্রকাশের সামর্থ্য অতি অল্পজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা অনেকেই কীট্‌সের মতো অনুভব করতে পারি কিন্তু সেই অনুভূতিকে তাঁর মতো করে কাব্যে প্রকাশ করতে আমরা প্রায় কেউই পারিনে।

কবিতা বা সাধারণভাবে যে কোনো কথা-শিল্পসৃষ্টির প্রধান লক্ষণ এই যে তা এমন একটা উপায় যার সহায়তায় পূর্ণ পরিণত কাব্যের মূল উপাদান যে ধরনের অনুভূতি সেই ধরনের অনুভূতি পাঠক-মনে সঞ্চারিত হয়। কখনো বা পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত অনুভব 'কাব্যময়তায়' কবির লক্ষ্যকেও অতিক্রম করে যায়। সাহিত্যের পরিশুদ্ধ ভাষা যখন চরম কুহকময়তার স্তরে উত্তীর্ণ হয় তখন তা এমন সংবেদকে জাগ্রত করে যার তুলনা যোগারূঢ় অবস্থার অব্যবহিত পূর্বের বা পূর্ণযোগারূঢ় অবস্থার স্বয়ং-আবির্ভূত নিরুপাধিক উপলব্ধি। চিন্তার মধ্যে যা অচিন্ত্য, সংসারের মধ্যে যা 'সৎ' বা তথতা তা কখনো কখনো (ইন্দ্রিয়ের দ্বার যখন পরিচ্ছন্ন) রন্ধ্রিলভগ্নপ্রাচীরজাত কোনো একটা কুসুমের বিষয়ে রচিত কবিতায় কিংবা সেই কুসুমের সরাসরি উপলব্ধিতে আবির্ভূত হয়। ইলিয়টের (Eliot) ভাষায়, দিব্যকলার (apocalyptic art) এইসব ভগ্নাংশ ব্যবহার করে আমাদের নিজেদের ভগ্নদশার সংস্কার করতে পারি, কিংবা আর্ণল্ডের (Arnold) ভাষায়, আমাদের 'পাতুক মনকে এই দুঃসময়ে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।' আর, এই মেরামতি বা ঠেকা দেওয়া কতটা

কার্যকরী ? প্রায় ততটা,—অনেকের মতে ঠিক ততটা,—যতটা কার্যকরী আইভি পুষ্পের বা সোনালী ডাফোডিল গুচ্ছের পক্ষে হলুদ রঙের মৌমাছির অবলম্বন। সাহিত্যে শব্দবিন্যাস বদলে দিন, অমনি দেখবেন তার দিব্যগুণ বিলুপ্ত হয়েছে, বিলীন হয়ে গেছে তার সেই রহস্যময় ক্ষমতা যার বলে এই শব্দমালা পতনোন্মুখ মনকে আশ্রয় দেয় কিংবা তার ভগ্নদশার সংস্কারে সাহায্য করে।

অপর পক্ষে, কোনো বৈজ্ঞানিক রচনার কথা বদলে দিলেও যতক্ষণ তার অর্থস্বচ্ছতা বজায় থাকে ততক্ষণ তার কোনো অঙ্গহানি ঘটে না। বিজ্ঞানের পরিশুদ্ধ ভাষা প্রকৃতিতে সাধনমাত্র। এই ভাষা একটা উপায়মাত্র, যে উপায়কে ব্যবহার করে সার্বজনিক অভিজ্ঞতাকে পরিচিত কোনো অনুমানকাঠামোর মধ্যে সংবদ্ধ করে কিংবা এই পুরোনো কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন কোনো অনুমানকাঠামোর মধ্যে সুসজ্জিত করে বোধগম্য করা হয়।

সাহিত্যকলার পরিশোধিত কথা কিন্তু সাহিত্যেতর কোনো লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় নয়। সে নিজেই নিজের লক্ষ্য। নিজেই একটা সিদ্ধবস্তু। আপন সার্থকতায় ও সৌন্দর্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা বস্তু। গ্রিমের (Grimm) মায়াবী 'স্থালিকা' (Tischlein) বা আলাদীনের প্রদীপের মতো সে নিজেই একটা ইন্দ্রজাল। বৈজ্ঞানিক বিবরণ একটা সাধন বা উপায় মাত্র। তাই এই বিবরণকে দশরকমভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব, দশরকমে তার শব্দসজ্জাকেও পরিবর্তিত করা সম্ভব এবং এই দশটা পরিবর্তিত বিবরণের প্রত্যেক-টাই পরিপূর্ণভাবে কার্যোপযোগী।

যখন নব নব তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিবরণের উপযোগিতা লুপ্ত হয়ে যাবে তখন এই বিবরণ তার পূর্বের এই ধরনের বিবরণের মতোই নিরর্থক হয়ে বিস্মৃত হয়ে যাবে।

সাহিত্যসৃষ্টির নিয়তি ভিন্ন প্রকারের। সার্থক কলা কালোত্তীর্ণ। সেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির ফলে 'চসারের (Chaucer) সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়নি। যে সৌন্দর্য সহজ, যে অর্থ সহজ, তা দীর্ঘস্থায়ী। অপর পক্ষে, বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক অনুমানকলাপের মধ্যে আবদ্ধ উপায়ধর্মী যে তথ্য বা বিবৃতি, তা অতি অল্পায়ু। তবু এই সব অল্পায়ু সৃষ্টি সংঘবদ্ধ হয়ে, সারিবদ্ধ হয়ে এমন এক জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছে যা ধাতুস্তম্ভের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী। এ যেন একটা চরস্থাপত্য, একটা বিরাট সদাসচল পিরামিড যা আয়তনে ক্রমশঃ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। এই বিরাট স্থাপত্য সম্মিলিত বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সম্মুখ-চর স্থাপত্য। একথা আমরা যেন না ভুলি যে 'যে হৃদয় মুখ চেয়ে ও হাত পেতে থাকে', প্রকৃতির মুখ চেয়ে, শিল্পির মুখ চেয়ে থাকে আর এই প্রকৃতি আর শিল্প উপলব্ধির যেটুকু আশীর্বাদ বহন করে আনে, অস্তিত্বকে ধারণ করতে যতটুকু সাহায্য করে ততটুকু নম্রশিরে গ্রহণ করে, সেই মুখ-চেয়ে-থাকা হৃদয় আশু একদিন সর্বনাশের সম্মুখীন হতো, যদি না এই হৃদয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকতো সেই মস্তিষ্ক যা অপরিণত অভিজ্ঞতাকে যুক্তির-শৃঙ্খলায় বাঁধা ধারণায় রূপান্তরিত করে, যদি না এই হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গী হয়ে থাকতো মানুষের সেই দুই বাহু যারা এই ধারণাদের দ্বারা চালিত হয়ে অভিনব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় কিংবা অভ্যস্ত কর্মে দক্ষতা অর্জন করে। মানুষ শুধু ধ্যানের উপলব্ধি আর শিল্পের ধন নিয়ে বাঁচতে পারে না। ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণীর প্রত্যেকটি শব্দের তার যেমন প্রয়োজন, তেমনই তার প্রয়োজন শুদ্ধ তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের এবং তার সঙ্গে প্রয়োগ বিজ্ঞানের।

ষোল

আত্মলীন ও সার্বজনীন। নাম ও রূপ। ধারণার জগৎ ও অতলস্পর্শ প্রত্যক্ষ সংবেদের ভূয়িষ্ঠতা। একদিকে বিজ্ঞান বর্ণনার সংজ্ঞাশ্রিত ঋজুতা আর অপরদিকে কুহকময়, বহুধ্বনিময় সাহিত্যের শুদ্ধতা। বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে স্নো-কথিত এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের নিরসন হবে কেমন করে ?

এদেব দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী রকম হওয়া উচিত নয় তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ডারউইন (Darwin) তাঁর আত্মজীবনীতে যে প্রকার সম্পর্ক কল্পনা করেছেন এই সম্পর্ক সেই রকম হওয়া উচিত নয়। ডারউইন যৌবনে মিলটন (Milton) ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (Wordsworth) কবিতায় আনন্দের সন্ধান পেতেন, কিন্তু জীবনের শেষদিকের দিনগুলিতে তিনি শিল্পউপলব্ধির শোচনীয় এবং অদ্ভুত বিলুপ্তিতে পীড়িত হয়েছেন। এই সময়ে মিলটন ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে তাঁর দুঃসহভাবে মূঢ় মনে হোতো। একবার সেক্স্পীয়র পড়তে গিয়ে তিনি এমন তীব্র বিরাগ অনুভব করলেন যে সেই বিরাগ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত হোলো। ডারউইন যেমন নির্বাচিত তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক বর্ণনার পরিশুদ্ধ অনন্য-অর্থত্বের প্রতি বিশেষ এক মানসিকআধিরূপ প্রবণতায় ভুগেছিলেন, অনেক কবিও তেমনি তাঁদের একদেশদর্শী কাব্যপ্রীতিতে বিমূঢ় থেকে গেছেন। যেমন, কবি ব্লেক (Blake) প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দিব্যরহস্যকে শুধুমাত্র পরিমাপ্য ভৌতিক উপাদানে অর্থাৎ ডেমো-ক্রিটাসের (Democritus) পরমাণু আর নিউটনের আলোক-কণায় বিশ্লেষণ করার জন্য বৈজ্ঞানিকদের কোনোদিন ক্ষমা করতে

পারেন নি। এই ধরনের বিজ্ঞানবিরোধী প্রত্যয়ের নেশায় উত্তেজিত হয়ে কবি কীট্‌স সেই মানুষটির মৃত্যু কামনা করেছিলেন যিনি ইন্দ্রধনুর ইন্দ্রজালের ভৌতিক ব্যাখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যকে।

কিন্তু, বস্তুত, সাহিত্যপ্রীতিকে ও সাহিত্য উপলব্ধিকে বিসর্জন না দিয়েও সক্রিয় বৈজ্ঞানিক হওয়া সম্ভব। ডারউইনের সমসাময়িক, তাঁর তরুণতর ভক্ত, টি. এইচ. হাক্সলে (T. H. Huxley) লিখে গেছেন, 'আমি মানুষের জ্ঞানের এমন কোনো ধারার সংস্পর্শে আসি নি যা আমাকে আকর্ষণ করে নি, যাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে আমার ইচ্ছা হয় নি। আমি এখন পর্যন্ত শিল্পের এমন কোনো রূপ দেখি নি যার সংস্পর্শে এসে মানুষের অনুভবসাধ্য তীব্রতম সুখ অনুভব করি নি।'

আর, এই দুই 'কৃষ্টির' মাঝখানে যে লৌহযবনিকা তার অপর অঞ্চল থেকে ভেসে আসছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাণী। কীট্‌সের মতো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও ছিলেন ইন্দ্রধনুর ভক্ত ('আকাশে যখন রামধনু দেখি তখন আমার হৃদয় নেচে ওঠে')। ব্লেকের মতো তিনিও 'বিশ্লেষণ-মূলক চেষ্টা' আর বৈজ্ঞানিকদের 'একমাত্র বিশ্বছবি'র চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করতেন কল্পনাকে, বসন্তের বনানী থেকে বিচ্ছুরিত প্রেরণাকে, আর, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিজ্ঞানময় নিষ্ক্রিয়তাকে। তবু তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী স্যার আইজাক (Sir Isaac)-এর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণে বাধা হয় নি। তরুণ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিতে স্যার আইজাক (Sir Isaac) :

'মর্মর প্রতীক সেই মনের
যে মন মননের অনাবিষ্কৃত সমুদ্রের নাবিক একাকী।' (৩৪)

এই 'একাকী' শব্দের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক মোটামুটিভাবে যদিও ব্যক্তির একান্ত উপলব্ধির চেয়ে অনন্যতায়

দীনতর অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যাপৃত, তবু কবির দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক স্বভাবতঃ একাকী, সাধারণ্য থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে নেওয়া এক সত্তা। বৈজ্ঞানিক যে সত্য সন্ধান করেন সে সত্য আমাদের অন্তর্মগ্ন জীবনেব উপলব্ধ সত্য নয়। তাঁর সত্য বহিরাগত। শুধুমাত্র যুক্তি আশ্রিত ব্যাখ্যার বিতানে সুশৃঙ্খলভাবে বিধৃত এই সত্য। এবং এই শৃঙ্খলাও আরোপিত হয় বিমূর্ত ধারণা ও উপযুক্ত কল্পনা (hypothesis) নির্মাণ করে। কবি সেই গান গেয়ে ফেরেন যে গানে নিখিল মানুষ তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়, আর যে সত্য আমাদের প্রতি প্রহরেব সঙ্গী এবং মূর্তিমান সখাব মতো সেই সত্যের উপস্থিতিতে তিনি আনন্দমুখর হয়ে ওঠেন। কবি মানুষের প্রকৃতির আত্মরক্ষাব বপ্র, কবি মনুষ্যত্বেব ধারক ও বাহক। মানুষেব সঙ্গে মানুষের সহজাত কুটুম্বিতা আব প্রেমের বাণী সর্বত্র বয়ে বেড়ান কবি। মৃত্তিকা ও জলবায়ুর ভৌগোলিক ভিন্নতা, ভাষা ও আচারের বৈলক্ষণ্য, সামাজিক বিধি ও প্রথাব পার্থক্য সত্ত্বেও, বিস্মৃতির অতলে নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যাওয়া কিংবা ঘোর কলরবে চূর্ণ হয়ে পড়া কত কী কে উপেক্ষা করে, কবি তাঁর আবেগ আর বোধ দিয়ে ধরণীব্যাপ্ত মনুষ্যত্বের অতিবিভক্ত সাম্রাজ্যকে সংহত করেন।

কবিতা সকল জ্ঞানেব আদি ও অন্ত। মানুষের হৃদয়ের মতো অমর। যদি কোনোদিন বিজ্ঞান সাধকরা অপরোক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের মানবিক দশাব জড়ভিত্তিতে ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় বিপ্লবও ঘটিয়ে দেন, সেদিনও কবি ঘুমিয়ে থাকবেন না, যেমন তিনি আজও ঘুমিয়ে নেই। সেদিন তিনি যে শুধু বিজ্ঞানের পরোক্ষ পরিণামকে অনুসরণ করবেন বিজ্ঞানীদের পিছু পিছু তা নয়, সে দিন তিনি বিজ্ঞানসৃষ্ট বিষয়ের রাজ্যে অনুভবকে প্রস্তুত করে দিয়ে বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা করবেন। রাসায়নিক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী কিংবা খনিজ-তত্ত্ববিদদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে অতিদূরতম আবিষ্কারকে

অন্যান্য বিষয়ের মতো কবি তাঁর শিল্পের উপকরণরূপে গ্রহণ করবেন। অবশ্য যদি কখনো এইসব তত্ত্ব আমাদের সাধারণ প্রত্যয়ের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে, যদি কখনো বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার অনুগামীরা যে সব সম্পর্কের রাজ্যে এইসব তত্ত্বকে বিচার করেন সেই সম্পর্কের রাজ্য আমাদের এই সুখমুগ্ধ দুঃখদীর্ণ জীবনে দর্শন স্পর্শনের সীমার মধ্যে সরাসরি আবির্ভূত হয়। আজ যা শুদ্ধ বিজ্ঞানরূপে পরিচিত তা যদি কোনোদিন মানুষের কাছে এইভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে রক্ত মাংসের আকার গ্রহণ করতে উদ্যত হয় সেদিন কবি তাঁর দিব্য-চেতনা দিয়ে এই রূপান্তরণে সহায়তা করবেন আর এইভাবে সৃষ্ট অভিনব সত্ত্বাকে মানুষের গৃহকোণে যথার্থ পরিজনের মতো সাদরে আমন্ত্রণ করবেন।

যদি এদিন কখনো আসে……। এই যদির মধ্যেই সমস্যাটা রয়ে গেছে। আজ আমরা বাতব্যাধি বা যৌনজীবনের দিকে যে আবেগময় মনোযোগ দিই তেমনি মনোযোগ আমরা যেদিন মহীলতার জননতত্ত্ব কিংবা পরমাণুতত্ত্বের দিকে দেবো সেদিন এই দুটো পৃথক সংস্কৃতি থাকবে না, থাকবে একটাই সংস্কৃতি। কবি সেদিন নিউক্লাইক (Nucleic) এসিড বা কোষকেন্দ্রের অম্ল আর তাদের লাস্যময়ী নায়িকাদের নিয়ে কাব্য রচনা করবেন, কিংবা কাব্যরচনা করবেন ঊর্জাণুর গতিবিজ্ঞান (Quantum mechanics) বা শিশুমৃত্যুকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। আর সেদিন বৈজ্ঞানিক গবেষকরাও গীতিকবিতার মধ্যে শুধু আনন্দের খোরাক নয়, কিছু লাভেরও সন্ধান পাবেন। এখন পর্যন্ত জীবনধারণের পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব, জননতত্ত্ব ও জৈবরসায়নের তত্ত্ব অতি অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে প্রয়োজনের বস্তু। বেশীরভাগ মানুষ নিরুত্তাপ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ব্যাপারে উৎসাহহীন। ব্যাখ্যামূলক ধারণা দিয়ে গড়া যুক্তিসিদ্ধ যে তন্ত্র (System) বিজ্ঞান বলে পরিচিত সেই

বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরও কম। এমনকি প্রয়োগ-মূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্পাশ্রিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্র সেই সব ব্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহী যাদের দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবন প্রভাবিত। বলেছি 'যদি কোনোদিন বিজ্ঞানসাধকদের কর্মের ফলে জীবনের জড়ভিত্তিতে বিপ্লবও ঘটে যায়···।' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth)-এর কাল থেকে বিজ্ঞানীদের কার্যকলাপ জীবনের জড়ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছিল। এই বিপ্লব আজ আমাদের কালের মজ্জার মধ্যে অবিরত প্রসারিত হচ্ছে ও তা অতি দ্রুতবেগ অর্জন করেছে। জীবনের জড়ভিত্তির বিপ্লব কখনো নিতান্ত জড়বিপ্লব নয়। এই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্তরেও বিপ্লব ঘটে। সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে, দর্শনে ও ধর্মবোধে বিপ্লব ঘটে, আর বিপ্লব ঘটে ব্যক্তির জীবনধারণ পদ্ধতিতে এবং তার আচরণের রীতিতে। প্রসরমান প্রয়োগ শিল্পের ফলস্বরূপ ঐসব পরোক্ষ বিপ্লব সম্পর্কেই মাথাব্যথা। ব্যবহারিক সুফলপ্রসবী নানাপদ্ধতির সমাহাররূপে যে প্রয়োগবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগরূপ যে শিল্পবিজ্ঞান, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নাই।

দলগতভাবে বিচার করলে শুদ্ধবিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রতি সাহিত্য-সাধকের মনোভাব তাঁদের চেয়ে প্রতিভায় অনেক ন্যূন যে সাধারণ মানুষ তাদের মনোভাবেরই সমতুল। আবেগনিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা কার্যতঃ প্রমাণিত, বিতর্কসিদ্ধ তত্ত্বকলাপরূপ যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানের প্রতি এঁরা কোনদিনই যথেষ্টভাবে আকৃষ্ট হন নি। ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে বিচার করতে বসে এঁরা সদা-অগ্রসর প্রয়োগবিজ্ঞানের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফলশ্রুতির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন বটে, কিন্তু যে তত্ত্ব-প্রপঞ্চ প্রয়োগবিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ সেই তত্ত্ব-প্রপঞ্চের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন নি। সুবদ্ধ (classical) সাহিত্যের বিপুল পরিসরের মধ্যে একটা মাত্র কবিতার খবর আমরা জানি যে কবিতার বিষয় মানুষের শ্রমবাঁচানো একটা যন্ত্র। এই কবিতা গ্রীক সাহিত্য-সঞ্চয়িতার অন্তর্ভুক্ত Antipater-এর ছোট্ট কবিতা। এই কবিতাটি জলচক্রচালিত যাঁতার গুণকীর্তনে রচিত। ক্রীতদাস রমণীদের গম বা যব পেষণের দৈনন্দিন খেদ থেকে মুক্তি দিয়েছিল এই যন্ত্র। আধুনিক কালের সীমার মধ্যে দিদেরোই (Diderot) একমাত্র উল্লেখযোগ্য লেখক যিনি তাঁর সমকালীন প্রয়োগবিদ্যার জ্ঞান অর্জ্জনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভাকে এই জ্ঞানের প্রচারে ব্যবহার করেছেন।

বেশীর ভাগ সাহিত্যিক যখন প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখতে বসেন তখন তাঁরা দুঃখসুখমগ্ন মানুষের জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখেন। যে তত্ত্ব যন্ত্রে মূর্ত সেই তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষক-

রূপে লেখেন না কখনো। বাষ্পীয়যানের স্বর্ণযুগে টেনিসনের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিও সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন যে বাষ্পীয়যান লৌহবর্ত্ম ধরে চলে না, চলে কোনো 'শব্দ-মুখর প্রসীতা (Groove)' ধরে। বাষ্পীয়যানের নির্মাতারা তার অগ্নিশ্বাসী সরীসৃপ রূপটিকে চাপা দিতে পারেন নি বলে রাসকিন (Ruskin) বাষ্পীয়যানের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ভিক্টব হুগো (Victor Hugo) পরমোৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে অর্ণবপোত Great Eastern-এর বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু সেই অলঙ্কারবহুল বর্ণনা থেকে Brunel-এর বিখ্যাত পোতের আকাব-প্রকার বা শক্তির কোনো অনুমানই করা সম্ভব নয়। আন্তর-জ্বলনচালিত চালকযন্ত্র (Internal combustion engine) এবং দৌড়-প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত মোটর যানের বিস্ময় নিয়ে গ্যাব্রিয়েল দানুন্‌ৎসিয়ো (Gabrieled' Annunzio) যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তা ভিক্টর হুগোর (Victor Hugo) বাষ্পীয় পোত বা বাষ্পীয় শকট প্রসঙ্গে উচ্চারিত উচ্ছ্বাসের চেয়ে কোনোদিক থেকে অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ নয়। অন্ততঃ এ কথা বলা যায় যে, এই সব লেখকেরা তাঁদের সমকালীন প্রয়োগবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থানীয় তত্ত্বাবলীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন না। তত্ত্বের প্রতি বা যেটুকু আকর্ষণ ছিল তার চেয়ে অনেক কম আকর্ষণ ছিল ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে এই সব তত্ত্বের প্রয়োগের নানান কৌশলের প্রতি।

আঠার

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অতি আধুনিককালের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা নানা ইউটোপীয়া বা রামরাজ্যের রূপরেখা রচনা করেছিলেন তাঁদের কল্পনাশক্তি কিন্তু শুদ্ধ ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা রচনায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শুদ্ধবিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞান-আশ্রয়ী সজীব কল্পনাশক্তি আমাদের যুগের প্রাগ্রসর বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার পরিবেশে উদ্ভূত। বিজ্ঞান যখন আদিম অবস্থায় এবং প্রয়োগবিদ্যা খুব নিম্নস্তরে ছিল তখন আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারীরাও তাঁদের পরিবেশ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক কোনো পরিবেশের কল্পনা করতে পারেননি। লিওনার্ডো (Leonardo) ট্যাঙ্ক বা লৌহরথ ও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের নক্সা তৈরী করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষেও এদের চালনার জন্য মানুষ ও জন্তুর পেশীনিহিত শক্তি কিংবা বায়ুশক্তি বা পড়ন্ত জলধারার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো শক্তির উৎস কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত 'প্রকল্পক'রা (projectors) যন্ত্রসাধিত কৃষি সম্পর্কে বহু প্রকার বৃহৎ বৃহৎ প্রকল্পের কথা সোৎসাহে ঘোষণা করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁদের সর্বার্থসাধক কৃষিযন্ত্র বায়ুচক্র (wind mill) দ্বারা চালিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত হয়েছিল বলে এই যন্ত্র কোনোদিন ব্যবহার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। গ্রীক পুরাণের ইকারাসের (Icarus) কাহিনীর যুগ থেকে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষ তার ওড়ার সমস্যা সমাধানের যা কিছু পরিকল্পনা রচনা করেছে সেই সমস্ত পরিকল্পনা ভর করেছে তার দুই বাহু আর দুটো পায়ের শক্তি দিয়ে চালিত

দুটো ডানার ওপর। মন্টগলফিয়ের (Montgolfier)-এর পর থেকে নবযুগস্বপ্নবিলাসীরা সমুদ্রপোতের মতো মাস্তুল ও পাল সম্বলিত গ্যাসপরিপূর্ণ এবং মনুষ্যচালিত আধারই কল্পনা করেছে। আরও কয়েক বৎসর পরে এই কাল্পনিক আকাশপোতগুলিতে অগ্রপশ্চাৎ গতিসম্পন্ন বাষ্পীয় ইঞ্জিন (reciprocating steam engines) ও শূন্যে ঝোলানো পদচালিত চক্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকের জুল ভের্ণ (Jules Verne)-এর উড়ে যাওয়ার দুঃসাহসিক কল্পনা পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে ত্বরিত গতিতে অগ্রসর-মান বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদ্যার অভিজ্ঞতায় বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। যেদিন এই বৈজ্ঞানিক উপকথার স্রষ্টা তাঁর লেখকজীবন আরম্ভ করেন তারপর থেকে শতবর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর, কালের এই ব্যবধানে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার যে উন্নতি হয়েছে তা 'পৃথিবী থেকে চন্দ্র' কাহিনীর রচয়িতার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক উপকথার স্রষ্টারা আধুনিক জীবনের তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাই আজকের দিনের দ্বিতীয় শ্রেণীর উপকথাকারদের কল্পনা ও সাহসিকতা, অতীতের সমস্ত 'নবযুগ' বা 'যুগান্তর' পরিকল্পকদের কল্পনার চেয়ে উৎকর্ষ ও বিস্ময়ে অনেক সমৃদ্ধ।

উনিশ

বৈজ্ঞানিক কল্পনার ইতিবৃত্তে এই সংক্ষিপ্ত পর্যটন সেরে এবার আমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে মনোনিবেশ করবো এবং দেখবো কীভাবে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে কবিদের, প্রভাবিত করেছে। উপযোগিতা ও উপদেশমূলক কবিতা এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বমূলক কবিতা, গ্রীসদেশে এই দুই ধরনের কবিতা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। হেসিয়ড (Hesiod)-এর Works and Days ('কাজকর্ম ও দিনক্ষণ')-এর মধ্যে অন্যান্য রচনার সঙ্গে কৃষিকর্ম ও মেষপালন সম্পর্কে একটা পদ্যবন্ধ রচনা পাই। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বমূলক কবিতা Hesiod-এর পরবর্তী যুগের সৃষ্টি। যে কবিতায় পারমেনাইডিস (Parmenides) তাঁর এক ও বহুর তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন এবং ধারণালব্ধ সত্য ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ বিষয়সম্পর্কে অনুমানের মধ্যে বৈষম্যের প্রসঙ্গ বিচার করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কবিতার বিচ্ছিন্ন কয়েকটা খণ্ডমাত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। এমপিডক্লিস (Empedocles)-এর অসাধারণ রচনার ভাগ্যেও এই বিপর্যয় ঘটেছে। মৌলিক পরমাণুবাদ, আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন আর এই পরিবর্তনগুলির সমন্বয়ের ফলে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন, শারীরিক দশার ওপর নির্ভর-শীল মানসিক অবস্থার তত্ত্ব ও এই তত্ত্বের একটা বিচিত্র অনুসিদ্ধান্ত যথা নৈতিক সদাচরণের সমস্যা আসলে যথাযথ খাদ্য নির্বাচনের সমস্যা, ইত্যাদি তত্ত্বের অস্পষ্ট আভাস আছে এমপিডক্লিসের রচনায়।

লাতিন সাহিত্যেও আমরা এই ধরনের দুটি সম্পূর্ণসংরক্ষিত

অত্যুৎকৃষ্ট রচনার সন্ধান পাই। একটা লুক্রেসিয়াস (Lucretius) -এর De Rerum Natura ও অপরটি ভার্জিলের (Virgil) Georgics. প্রথমটি একটি অতিব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা আর দ্বিতীয়টি পদ্যে রচিত নিবন্ধমালা। এই পদ্যনিবন্ধমালা আশ্চর্য প্রসাদগুণসম্পন্ন। এর বিষয়বস্তু গ্রামজীবনের মনোহারিত্ব আর কৃষিকর্মপদ্ধতি। বিজ্ঞান যতো শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে ততই এই ধরনের উপদেশাত্মক কবিতা ব্যাখ্যানমূলক গদ্যকে স্থান ছেড়ে দিয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে নিছক শিক্ষামূলক কবিতা—তার বিষয় শুদ্ধ বিজ্ঞানই হোক বা প্রয়োগবিদ্যা হোক—একটা ব্যতিক্রম এবং নিতান্তই সেকেলে বস্তু। এই ধরনের পদ্যরচনায় শুধু নিম্ন কোটির কবিরাই আকৃষ্ট হন। Georgics-এর আধুনিক কালের অনুকৃতি John Phillips-এর Cyder, Dyer-এর Fleece, Abbe' Delille-এর Les Jardins. De Rerum-এর আধুনিক অনুকৃতি Tiedge-এর অবসাদজনক Urania, আর Erasmus Darwin-এর কেতাদুরস্ত কিন্তু উপহাস্য সৃষ্টি। আধুনিক কোনো শতাব্দীতেই প্রথম শ্রেণীর কোনো কবি লুক্রেসিয়াস (Lucretius) ও এমপিড-ক্লিস (Empedocles)-এর রচনার মতো কোনো রচনায় হাত দেননি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তথ্য কবিতায় স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু সে স্থান নিতান্তই আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের স্থান। যদিও কবিদের বেলায় বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখ দৈবাৎ ঘটনামাত্র তবু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যাটা থেকেই যায়। নীচে উদাহরণস্বরূপ দুটো স্তবকের উল্লেখ করা হোলো। একটা স্তবক নেওয়া হয়েছে জন ডন (John Donne)-এর A Valediction ও দ্বিতীয়টি তাঁরই রচিত The Extasie কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে।

পৃথিবীর অপসরণ
মানুষের ক্ষতি আর আতঙ্কের কারণ,
মানুষ এর মাপজোপ করে, হিসেব করে ;
কিন্তু অন্যসব নভঃপিণ্ডদের হৃদকম্প
পরিমাণে অনেক তীব্র
তবু মানুষের কাছে তা অনিষ্ট শূন্য। (৩৫)

আর,

আমাদের শোণিত
আমাদের আত্মার প্রতিকৃতিতে
নতুন আত্মা গড়ার
প্রচেষ্টায় রত।
এমনি সব আঙুল দিয়েই বুনতে হবে
সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থি,
যে গ্রন্থি আমাদের মনুষ্যত্ব…(৩৬)

ডন তাঁর দিনের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই সব বিদগ্ধ উপমার আশ্রয়ে তিনি তাঁর জ্ঞানকে অসাধারণ কৌশলে ব্যবহার করেছেন, বিদায় ও বাসর মিলনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভবকে চিত্রিত করেছেন। মধ্যযুগীয় দর্শনে লালিত পাঠকদের কাছে তাঁর এই ধরণের বৈজ্ঞানিক উপমা নিশ্চয় অত্যন্ত সার্থক বলে মনে হতে পারতো। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক বিশ্ব টলেমি (Ptolemy) ও গালেন (Galen)-এর বিশ্ব নয় ; এ বিশ্ব পালোমার (Palomar) ও জোদরেল ব্যাঙ্ক (Jodrell Bank)-এর বিশ্ব, দেহরসায়ন ও মস্তিষ্ক-বিদ্যুৎ-লেখের (EEG) বিশ্ব। আজও আমরা ডনের রচনা পড়ি, তার কারণ তিনি তাঁর আশ্চর্য শৈলীতে তাঁর গোষ্ঠীর শব্দাবলীতে শুদ্ধতর ব্যঞ্জনা আরোপ করেছেন। পড়ি এই কারণে যে তিনি এই সব পরিশুদ্ধ শব্দের আশ্রয়ে আমাদেরই আন্তর

অনুভবের সংগোত্র বিশেষ বিশেষ আত্মগত অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন।

প্রাক্-কোপার্নিকাস (Copernicus) জোতির্বিজ্ঞান ও প্রাক্-হার্ভে (Harvey) শারীরতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল বলে আমরা তাঁর রচনা পড়ি না। নভঃপিণ্ডদের স্পন্দন তত্ত্ব কিংবা প্রাণশক্তি (vital spirits) ও তার স্নায়ুসঞ্চারিত রূপ (animal spirits) এসব তত্ত্বে আমাদের রুচি নাই। আর, এসব তত্ত্ব কেনই বা আকৃষ্ট করবে আমাদের? আমরা জানি এই পিণ্ডেরা আর এই চৈতন্য তত্ত্ব অলীক। আমরা যারা অবলুপ্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুশীলন করিনি তারা বুঝতেই পারবো না কেন এই পিণ্ডেরা স্পন্দিত হয়, কেনই বা শোণিত-সৃষ্ট বিদেহী প্রাণশক্তি তার সূক্ষ্ম গ্রন্থি বুনে চলে।

দান্তের আধুনিক পাঠকও এই ধরনের মুস্কিলের সম্মুখীন। তবু কেন আমরা এখনো Divine Comedy পড়ি? পড়ি এইজন্য যে এই মহাকাব্যের রচয়িতার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, অনুভূতি ছিল তীব্র, আর সবার উপর তিনি শব্দ শুদ্ধ-করণের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দান্তে শুধু কবিই ছিলেন না, দান্তে পণ্ডিত ছিলেন, বিপুল বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। আর যে সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রস্তাবিত, আলোচিত ও নিশ্চিতভাবে (মধ্যযুগের দার্শনিকদের দর্প!) মীমাংসিত হয়েছিল সেই সব সত্য সম্পর্কে দান্তে অবহিত ছিলেন। Divine Comedy পড়তে পড়তে আধুনিক কালের ছাত্র এমন সব ছত্রে হোঁচট্ খান যেগুলো তাঁর কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্য এই কারণে যে এই সব ছত্রে বিচিত্র এক ধরনের কাব্যিক সংক্ষিপ্ত লিখনে বা শর্টহ্যাণ্ডে মধ্যযুগীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের সার বিধৃত হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলো থেকে কোন্ অর্থ উদ্ধার করবেন আধুনিক পাঠক?

'যখন (থেমেছে) প্রথম নভোমণ্ডলের
সপ্তনক্ষত্রের সেই রথ
যার উদয় নাই, অস্ত নাই,
পাপ ব্যতিরেকে যার অন্য কোনো গুণ্ঠন নাই,
যা এই স্বর্গের প্রত্যেককে
সচেতন করে কর্তব্যে
যেমন করে বহিত্রবাহী নাবিককে
পোতাশ্রয়ের পথ দেখায়
লঘু সপ্তর্ষি। (৩৭)

(Divine Comedy : canto xx lines 1-5)†

ভাষ্যকারের সাহায্য আর বিদগ্ধ টীকার সরঞ্জাম ব্যতিরেকে বিংশ-শতাব্দীর পাঠকের পক্ষে দান্তের উদ্দিষ্ট অর্থের বোধ অসাধ্য ও অসম্ভব।

কবি তাঁর নিজের ও অপরের অপেক্ষাকৃত আত্মগত অনুভব নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় 'নিখিল পৃথিবী ও নিখিল কালব্যাপ্ত বিপুল মনুষ্য সমাজের সাম্রাজ্যকে তাঁর রজোবীর্য আর জ্ঞান দিয়ে সংহত করে তোলেন।' কিন্তু যেই তিনি অন্য জ্ঞান বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন—জ্ঞান বলতে যুক্তিসিদ্ধ ধারণার আয়তনে বদ্ধ বহির্বিষয়ের জ্ঞান—তখন তিনি মহত্তম কবি হলেও এই মানব সাম্রাজ্যকে সর্বকালে সংহত করতে পারেন না। কয়েকশতাব্দী বা কয়েক প্রজন্ম অতিবাহিত না হতে হতেই তাঁদের যে বৈজ্ঞানিক উপমা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত একদিন এতো উজ্জ্বল ছিল, সমসাময়িকতায় এতো সার্থক ছিল তারা অর্থহীন হয়ে বোধগম্যতার বাইরে চলে যায়।

গতপ্রয়োগ বিজ্ঞানপ্রসঙ্গের বিবরণ যত স্পষ্ট ততই তা

† মূলে এই নির্দেশ অবশ্য নাই।

অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় পরবর্তী কালের অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অগ্রসর যুগের পাঠকদের কাছে। দান্তের সংস্কৃতিবিজ্ঞান বা জগৎসৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmogony) অতিমাত্রায় সুসংহত। এবং অতিমাত্রায় সুসংহত বলেই নানাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত দান্তের বিজ্ঞান তত্ত্বগুলি এতোটা ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, তাঁর কল্পিত বিশ্বছবি এতো উদ্ভট হয়ে উঠেছে এবং সেই বিশ্বছবি একটা অসার অলৌকিকত্বে বিস্বাদ হয়ে গেছে। (বিশ্ব বলতে মধ্যযুগের সেই নিশ্ছিদ্র, বড় বেশী মানুষী ছাঁচে-ঢালা বিশ্ব, যে বিশ্বে প্রত্যেক প্রাকৃত বস্তুই হয় আরিসতোতলের (Aristotle) কোনো ধারণার, নয় বাইবেলের কোনো বাক্যাংশের উদাহরণ মাত্র)। পরবর্তী যুগের পাঠকের কাছে সেক্‌স্‌পীয়রের অস্পষ্ট দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভাবনা দান্তে বা ডনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশী রুচিকর।

ব'সো জেসিকা ব'সো !
ঐ দেখো আকাশের আঙিনায়
উজ্জ্বল সোনার অজস্র রেকাবী ঘন ক'রে পাতা।
সব চেয়ে ছোট যে বিম্ব সেও চলতে চলতে
দেবদূতের মতো গান শোনাচ্ছে
তরুণ নয়ন দেবশিশুদের।
এমনি কলস্বর বাজে অমর আত্মায়।
কিন্তু, আত্মা যতদিন মাটির মর আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা থাকে
ততদিন এ গান তার শ্রুতির গোচরে পৌঁছেনা। (৩৮)

এই উদাহরণে টলেমি প্রকল্পিত জগৎ বিন্যাস, পীথাগোরাসের সঙ্গীতমুখর নভোপিণ্ড, আরিসতোতলের De Coelo, ইহুদী ও ক্রীশ্চানদের দেবদূততত্ত্ব—এক কথায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্ত্বের বিতত জ্ঞানকাণ্ড স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে সেকস্‌পীয়র প্রচলিত তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে

প্রবেশ করেন নি। এক্ষেত্রে ডন বিবৃত 'কম্প্র' কিংবা দান্তেবর্ণিত প্রথম স্বর্গের ঋক্ষমণ্ডল তত্ত্বের কোনো চিহ্ন নাই। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অস্পষ্ট হলেও কাব্যের দিক থেকে তাঁর 'উপমা 'সুস্পষ্ট।' সেক্‌স্‌পীয়র এখানে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দার্শনিকজ্ঞান পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্য এক প্রেমিকযুগলের উপর তারার আলোকস্নাত নিদাঘরাত্রির প্রভাব। ষোড়শশতাব্দী থেকে, মাঝের কালব্যবধানটা বাদ দিয়ে, সোজা ঊনবিংশশতাব্দীতে পৌঁছে আমরা পাই ওয়ালট হুইটম্যান (Walt Whitman) রচিত মুক্ত ছন্দের রাগৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ পদবন্ধ, আর Gerard Manley Hopkins-এর একটা সনেট।

> বিদগ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করছেন,
> স্তম্ভে স্তম্ভে প্রমাণ আর সংখ্যা সাজাচ্ছেন সারিবদ্ধভাবে,
> মানচিত্র ও রেখাচিত্র এগিয়ে দিচ্ছেন সম্মুখে
> যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে তাদের মেপে দেখার জন্য,
> সভার শ্রোতারা সরবে তারিফ করছেন
> কিন্তু আমি, কী জানি কেন, অবসন্ন হয়ে পড়লেম,
> তারপর স্থান ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে
> আপন মনে একাকী বিচরণ শুরু করলেম
> রাত্রির রহস্যময় সিক্ত বায়ুতে
> আর, সময়ে সময়ে চেয়ে দেখি
> আকাশে তারাদের দিকে
> চরম নিস্তব্ধতায়। (৩৯)

গেটে বলেছেন: প্রিয় বন্ধু, তত্ত্বমাত্রই পাণ্ডুর। এই সৃষ্টিতে একমাত্র যা হরিৎ তা' জীবনের স্বর্ণময় পাদপ। (৪০)

কিছু লোকের ক্ষেত্রে অবশ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুধ্যান প্রণয়ের অনুভব কিংবা সূর্য্যাস্তদর্শনের অনুভবের মতোই হিরণ্ময়।

হুইট ম্যান অবশ্য এদলের নন। তাঁর জীবনে দুঃখ-সুখই মূলসূত্র। দুঃখ-সুখ চালিত মানুষ তিনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব তাঁর বুকের ওপর হিম হয়ে চেপে বসে, তাই এসবকে পরিহার করে তিনি নৈঃশব্দ্য আর নক্ষত্রকে বেছে নিয়েছেন। কবির ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিত্যক্ত বা উষিত একটা তত্ত্বকে আশ্রয় করে ও তার সঙ্গে অচেতন সত্তায় চৈতন্যের 'উপরিতান' জুড়ে দিয়ে যে ভাবে হপকিন্‌স্‌ নক্ষত্রালোককে অনুভব করেছেন তা আমার মতে অবৈধ।

চেয়ে দেখো তাবাদের দিকে
চেয়ে দেখো আকাশের ভালে
চেয়ে দেখো আকাশে আসীন অগ্নিময় সত্তাদের দিকে।
ঐ দেখো কত যে উজ্জ্বল নগর! কতো দুর্গ বৃত্তাকার! (৪১)

এই দৃষ্টান্তে তত্ত্ব ও জীবন, ধারণা ও প্রত্যক্ষ সংবেদ এই উভয় জগতের নিকৃষ্টতম ব্যবহার ঘটেছে। অনন্যঘটনার সারমর্ম আর তার 'আন্তরছবি' যে সংবেদে ধরা পড়ে সেই সূক্ষ্ম সংবেদকে কবি হপকিন্‌স্‌ মার্জিত শব্দ প্রয়োগে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারেন যার তুলনা নাই, কিন্তু সেই হপকিনসেরই পতন ঘটেছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-আশ্রিত সালঙ্কার বাগ্মিতায়। 'আকাশে আসীন অগ্নিময়সত্তা' বা 'মণ্ডলাকার দুর্গ' ইত্যাদি ধারণা ষোড়শ শতাব্দীর বিদগ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় কাজে আসতে পারতো, কিন্তু এসব উপমা ভিক্টোরীয় যুগের কোনো কবির রচনায় (সেই কবির প্রিয় দার্শনিক Duns Scotus হলেও!) সম্পূর্ণ অচল।

কুড়ি

দান্তের প্রথম নভের ঋক্ষমণ্ডল কিংবা 'ডন'-এর (Donne) 'কম্প্র' বা শোণিতসৃষ্ট চৈতন্য ইত্যাদি বিগতপ্রয়োগ বৈজ্ঞানিক ধারণা আধুনিক পাঠকের বোধগম্য নয় এবং তাদের অন্তরে সমানুভূতি সৃষ্টির পথে বাধাস্বরূপ।

এর অর্থটা কি এই দাঁড়ায় যে বর্তমান কালের সাহিত্যসাধক হুইটম্যানের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য বিদগ্ধ জোতির্বিজ্ঞানীর বক্তৃতায় উপস্থিত থাকবেন এবং অবশেষে সাহিত্যিকের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য বক্তৃতা শেষ হবার পূর্বেই সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে অনবদ্য নির্জনতায় নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকবেন ? আমাব নিজের বিশ্বাস, নক্ষত্রেব জগৎ ও নাক্ষত্রিক পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎ, বক্তৃতা গৃহেব জনতা আর নৈরাশ্যের জগৎ, ধূসর তত্ত্ব জগৎ ও হরিৎ জীবন ও বহুবর্ণিল কবিতার জগৎ ইত্যাদি উভয়বিধ যে সব জগতে সাহিত্যসাধক ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বাস করতে বাধ্য সেই উভয়বিধ জগতের যথাসম্ভব উপলব্ধি সাহিত্যসাধক মাত্রেরই কর্তব্য। দান্তে ও ডনের দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে এক যুগের তত্ত্ব কয়েক শতাব্দী এমন কি কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই বোধগম্যতার বাইরে চলে যেতে পারে। যাক্ না! কবি যখন দাবী করেন যে তিনি ভাবীকালের জন্য লিখছেন তখনো বস্তুতঃ তিনি তার সমকালীনদের কাছেই তাঁর বক্তব্যকে হাজির করেন। অনেক সময় তাঁর শ্রোতা তিনি নিজেই, এবং তাঁর স্বগতোক্তিও সরাসবি ভাবী কালের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নয়। তা ছাড়া, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে কবি ভাবিকালীনদের লক্ষ্য করে

লেখেন তবু ভাবীকালীনরা যে তাঁর রচনা পড়বেন তার নিশ্চয়তাও খুব কম। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপার স্মরণে রাখা দরকার। অতীতে বিজ্ঞানের অভ্রংলেহী তত্ত্বরাজি অপর্যাপ্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সব সূত্র ধরে এই সব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হোতো তাদের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিতও করা হয়নি। কিন্তু একথা আজকের দিনের বিজ্ঞানের পক্ষে সত্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞান অর্বাচীন বিজ্ঞানের মতো কোনদিন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হবে বলে মনে হয় না। দান্তের বিশ্ব আর আজকের দিনের জোতির্বিজ্ঞানের বিশ্বের মধ্যে পার্থক্যটা গুণগত। আধুনিক জোতির্বিজ্ঞান ও আজ থেকে দু তিন শতাব্দী পরের জোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দেবে সে পার্থক্য সম্ভবতঃ শুধু সূক্ষ্মতার ও বিস্তারের পার্থক্যই হবে। আমাদের পূর্বসূরীদের "কম্প্র" বা "প্রথম নভোলোক" ইত্যাদি ধারণা আজ আমাদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। অপরপক্ষে ছায়াপথ পারের নীহারিকাপুঞ্জ ও 'সুপার নোভী' (Super novae) বা "অত্যুজ্জ্বল বিস্ফারিত নক্ষত্রবৃন্দ" ইত্যাদি আধুনিক ধারণা আমাদের প্রপৌত্রদের কাছেও সহজবোধ্য থেকে যাবে।

বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত এবং এইজন্য অতীতের বিজ্ঞানের মতো এই বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার সম্ভাবনা খুব কম। আর যদিই বা আমাদের এই বিজ্ঞান অতীত বিজ্ঞানের মতোই এতোই অর্বাচীন হয়ে পড়ে যে আমাদের উত্তরপুরুষরা আমাদের উল্লিখিত বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ সেদিন আর মোটেই বুঝতে পারবে না তাতেই বা ক্ষতি কি? আমাদের উত্তর-পুরুষেরা আমাদের রচনা হয়তো পড়বেই না। অতএব চিন্তা কি?

কিন্তু তাই বলে মনোরাজ্যের মাঝখানের এই লৌহযবনিকাকে ভেদ করার কাজে লেগে পড়বো না কেন? এ কাজ শুধু যে উৎকৃষ্ট কাজ তা নয়, একাজ প্রয়োজনীয়ও।

একুশ

বৈজ্ঞানিকযুগে সাহিত্যসাধকদের করণীয় কী এবং সাধ্যই বা কী তা নিয়ে জল্পনা করার পরিবর্তে দেখা যাক এই ক্ষেত্রে কী কতদূর করা হয়েছে। দেখা যাক, আমাদের শতাব্দীর মহান সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে, অকল্পনীয় উদ্ভাবনকে, আমাদের শতাব্দীর যুক্তিসিদ্ধ, কার্য্যকারিতায়-সফল অথচ সম্ভাব্যতার দিক থেকে অতি উদ্ভট ধারণাবলীর বিপুল-বিস্তার তত্ত্বজালকে আধুনিক কবিরা কীভাবে গ্রহণ করেছেন ? দেখা যাক্ গত দুইতিন প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা টেকনিকাল (তক্ষনিক) উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সব অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটছে সেই সব ঘটনা কবিতার বিষয়বস্তু বা তার সচরাচরব্যবহৃত উপমা বা চিত্রকল্পকে কী ভাবে প্রভাবিত করেছে ? এইসব প্রশ্ন আমি আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে, কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লিখিত এক প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলাম ও আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বেই এইসব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলাম।

"নূতন কবিতার মতামতের প্রচারকরা আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন যে আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অভিনব ও আশ্চর্য। বিশ্বাস করতে বলেছেন যে আধুনিক কবিরা এমন কিছু করেছেন যা অভূতপূর্ব।" লুই উনটেরমেয়ার (Louis Untermeyer) তাঁর সঙ্কলন (Anthology)-এর মুখবন্ধে বলেছেন : এই কয়েকটা পাতা যে সব কবির রচনা ধারণ করে আছে সেই কবিরা আমাদের এই অব্যক্ত ও কঠিন বাস্তবতার জগতের মধ্যে সজীব ও প্রবল প্রাণপদার্থের সন্ধান পেয়েছেন।

এঁরা যুগচৈতন্যের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁদের মতামতই যে শুধু পরিবর্তিত হয়েছে তাই নয়, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির চক্রবাল বিস্তৃত হয়ে বিগতদিনের কবিদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বহু বিষয়-বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এঁরা শুধু-রমণীয় ও যথার্থ-সুন্দরকে পৃথক করে দেখতে শিখেছেন, কলুষ নিঙড়ে কান্তিকে বের করে আনতে শিখেছেন, অবহেলিত স্থানে বিস্ময়কে খুঁজে পেয়েছেন এবং নির্জ্ঞান মনের তমসাবৃত কন্দরে গুপ্ত বিস্ময়ের সন্ধান পেয়েছেন। এই তত্ত্বের ফলিত অর্থ এই যে Carl Sandburg-এর ভাষায়, "অভিধূত আগুনের (blast fires) গর্জন ও গুরুগুরু-ধ্বনি," "অধম আর পতিত মানুষ", এরাই আধুনিক কবিদের বিষয়বস্তু। এর ফলিতার্থ এই যে এঁরা হোমারের মতো স্বাধীনতা পেয়েছেন, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনকে নাড়া দেওয়া ব্যাপারের যদৃচ্ছা ব্যবহার করছেন সাহিত্যে। হোমার লিখেছিলেন ঘোড়ার কথা, সহিসের কথা, আর আমাদের সমকালীনরা লিখছেন ট্রেনের কথা, মোটর যানের কথা, আর সেই পতিত আর অধমদের কথা যারা এই সব যন্ত্রের অশ্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত! নতুন কবিতার নবীনত্ব নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এই নবীনত্বের মূল লক্ষণ এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবমদশকের সূক্ষ্মকারুকার্যের মণিময়-চারুতার বদলে এসেছে দৈনন্দিন জীবনের ইতিকথা ও দৈনন্দিন সংবেদন। কবিতার মধ্যে যন্ত্র আর যন্ত্রায়ণ-যুগদর্শন, শ্রমিক বিক্ষোভ আর নির্জ্ঞানের মনস্তত্ত্ব আমদানি করা হলেও এর মধ্যে যথার্থ অভিনবত্ব বা আশ্চর্য নাই কিছুই। এইসব বিষয়ের সঙ্গে আমরা সরাসরি জড়িত, আমাদের দুঃখসুখের জীবন এদের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। হোমারের জীবনের পরিধির মধ্যে যেমন রাজা ছিল, যোদ্ধৃ ছিল, অশ্ব ছিল, রথ ছিল, যেমন চিত্রময়ী (picturesque) পুরাকাহিনী ছিল তেমনি এরাও রয়েছে আমাদের

দুঃখসুখের জীবনের পরিধির মধ্যে। নতুন কবিতার বিষয়বস্তু পুরাতন কবিতার বিষয়বস্তু থেকে কিছু ভিন্ন নয়। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু প্রকৃতিতে একই থেকে গেছে। এর মধ্যে যথার্থ অভিনবত্বের উদয় হোতো যদি কবিতায় অমূর্ত বৈজ্ঞানিক ধারণাবলী ব্যবহারের কোনো সন্তোষজনক পদ্ধতি যথার্থই আবিষ্কৃত হোতো।

এই কথাগুলো যখন লেখা হয়েছিল সেই সময় থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তবু কবিতার পরিবেশের কী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বহু লেখক ইংরাজী ও আমেরিকান কবিতার ভাষাকে সংস্কৃত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, নূতন ছন্দ, নূতন শব্দান্বয়, নূতন ধ্বনি আর দুঃসাহসিক শব্দ প্রয়োগের নূতন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন ও এই সব নূতনকে পরিবর্ধিত করেছেন। তবু কবিতার বিচরণ ক্ষেত্রের সীমানা বিশেষ বাড়ে নি।

কেনেথ অ্যালট (Kenneth Allott) লিখেছেন, "T. S. Eliot-এর অভিনন্দন প্রাপ্য, কেননা তিনি কাব্য রচনার উপযুক্ত বিষয়বস্তুর মণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, আধুনিক শিল্পনগরী, ইউরোপীয় ইতিহাসের পশ্চাদ্‌পট সবই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, আর ম্যাকনীসের (Macneice) মতে, পরিহাস, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপরূপ নানা অস্ত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর তূণীরে।" কিন্তু ম্যাকনীস দেখিয়ে না দিলেও আমরা দেখতে পেতেম যে কিছুকাল ধরে খ্রীষ্টীয় ভাবনা বেশকিছু কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর, যে যুগে শিল্পনগরীর জন্মই হয়নি সে যুগে কী করে এর ব্যবহার হতে পারতো কবিতায়? আর ইউরোপের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে দেখা যাবে যে ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) আর রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning)-এর রচনায় এর প্রচুর ব্যবহার হয়েছে।

ইলিয়ট মহান কবি তার কারণ তিনি তাঁর জাতির ভাষাকে অভিনব পথে, সুন্দর ভাবে ও বহু ব্যঞ্জনার আরোপে শোভিত করেছেন, কবিতার বিষয়বস্তুর পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন বলে নয়। আসলে এই দ্বিতীয় ধরনেব কাজ তিনি মোটেই কবেন নি। আব এ কথা তাঁর উত্তবসূরীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা যে আইনষ্টাইন (Einstein) ও হাইজেনবের্গেব (Heisenberg) সমসাময়িক, তাঁরা যে সমসাময়িক বৈদ্যুতিক-গণনাযন্ত্রেব, বিদ্যুদণুবীক্ষণ-যন্ত্রের, জননতত্ত্ব ও পাবমাণবিক তত্ত্বে আবিষ্কারেব সমকালীন, তাঁরা যে ক্রিয়াসিদ্ধিবাদ (operationalism), দিয়ামাত (diamat) ও অতর্কিত অভিব্যক্তিবাদ (emergent evolution)-এব সমসাময়িক এ সত্য তাঁদেব কবিকৃতি থেকে কোনোভাবেই অনুমান করা যায় না। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব, যুক্তি ও পবীক্ষণসাপেক্ষ বিজ্ঞানেব দর্শন এবং বিশেষ সামাজিক ও সাময়িক পটভূমিকা লব্ধ ব্যক্তিগত অনুভবেব সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান থেকে যুক্তি দিয়ে যে সর্ব্বতোমুখী মানবিক ও প্রাকৃতিক দর্শন সৃষ্ট হয়েছে সেই দর্শন এখনো পর্যন্ত আধুনিক কবিতায় অনুপস্থিত। তাই আধুনিক ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যেব ঐতিহাসিকবা বিংশশতাব্দীব দ্বিতীয় দশকেব সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন যে এই দশক 'কবিতায় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংবক্ষণেব কাজে ব্যাপৃত।'

কৃষ্টি বলতে অবশ্যই স্নো (Snow)-কথিত অবৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য বলতে এই কৃষ্টিব সঙ্গে যুক্ত ইহুদীক্রিশ্চান ও গ্রীক রোমের ঐতিহ্য। বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকের কবিবা (আধুনিক সমালোচনার অব-ভাষায়) 'সামাজিক বাতাবরণের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁকের পরিচয় দিয়াছেন'। ঠিক এই ঝোঁকের পরিচয় দিয়েছেন Piers Plowman এর কবি, ঠিক এই ঝোঁকেরই পরিচয় দিয়েছেন শেলী (Shelley) তাঁর Mask of Anarchy (নৈরাজ্যের মুখোস)

কবিতায়। অর্থাৎ, কবিতার রাজ্যের কোনো বিস্তার ঘটে নি। শুধু কোনো কোনো অবহেলিত প্রদেশকে পুনরধিকার করা হয়েছে। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই 'সমাজসংসক্তির' প্রতিক্রিয়া রূপে 'আত্মউন্মোচন' প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তার সঙ্গে এসেছে খ্রীষ্টীয় জীবনচর্যা আর রম্যরসচর্চার নব পর্যায় (neo-romanticism)। পঞ্চম দশকে এই সব প্রসঙ্গের কিছু কিছু লক্ষ্যগোচর হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিপুল প্রসারের এই যুগে কাব্যের বৈলক্ষণ্য রূপে যে বিজ্ঞান-সন্দর্ভ আমরা আশা করতে পারতাম সেই বিজ্ঞান-সন্দর্ভের উপর জোর ছাড়া আর সব কিছুই পাই কাব্যের ক্ষেত্রে। আমি যখন নতুন কবিতায় পুরোণো প্রসঙ্গের উপর মন্তব্য করেছিলাম তার পর থেকে চল্লিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে বিজ্ঞানকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে অতি অল্প কবিতাই রচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিতে যা ধরা পড়ছে তা উইলিয়ম এম্পসনের-(William Empson), 'নব-পরাবিজ্ঞান' (Neo-metaphysical) ধর্ম্মী কয়েকটা অনবদ্য কবিতা এবং কেনেথ রেকস্‌রথের (Kenneth Rexroth) মননময় গীতি কবিতা "Lyell's Hypothesis again"—"লিয়েলের (Lyell) কল্পনার পুনরাবৃত্তি।" মাত্র এই কয়েকটা দৃষ্টান্ত আপনা থেকেই আমার মনে পড়ছে। নিশ্চয়ই এছাড়াও অন্যান্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি লিখিত বেশীর ভাগ কবিতাতে আধুনিক চলতি ইতিহাসের সব চেয়ে যে বড় ঘটনা অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার যে ক্রমবর্ধমান প্রসার সেই ঘটনার প্রসঙ্গে বিন্দু-বিসর্গও উল্লিখিত হয় নি। ক্রমপ্রসরমান বিজ্ঞানের কিছু কিছু ফলাফল ব্যষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে বলে তারা কবির দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে

কিন্তু ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের ভাণ্ডার যে বিজ্ঞান, ক্রিয়া-প্রমাণিত ধারণার কলাপ যে বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও মানুষের সুসঙ্গত মিলিত দর্শনের বিশিষ্ট উপাদান যে বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞান হিসেবে বিজ্ঞান প্রায় কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এমনকি একথাও বলতে পারা যায় যে আধুনিক কবিরা সমস্ত বিগত শতাব্দীর পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে নিজেদের ও সমকালীনদের সেই সব আত্মগত উপলব্ধি নিয়ে ব্যাপৃত যে উপলব্ধির উৎস প্রকৃতি, সামাজিক পেষণ, আধিদৈবিক ও রাজনৈতিক ধারণাবলী, প্রেম বেদনা আনন্দ, মৃত্যু শোক কিংবা মৃত্যুর প্রত্যাশংসা।

বাইশ

যে যুগে বিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে গৌণ ছিল সেই যুগের কবিতার চেয়ে আমাদের এই সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক শতাব্দীর কবিতা বিজ্ঞান সচেতনায় ন্যূন। এই আপাতবিরোধী ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই বলা যায় যে আমাদের এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ বলেই বোধহয় কবিতার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ও সবিস্তারে বিজ্ঞান-অনুবন্ধী হওয়ার প্রয়োজন গেছে কমে। বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বিজ্ঞানের লোকরঞ্জক প্রচারও প্রসারিত হয়েছে। এর সাক্ষ্য দেবে প্রতিবছরে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞান শাখার অসংখ্য বিবরণী, অত্যাধুনিক প্রগতির সংক্ষিপ্তসার ও প্রচলিত চিন্তাধারার চুম্বক। লোকরঞ্জক বিজ্ঞান একটা নূতন শৈলীর প্রকাশ, যা একাধারে পাঠ্যপুস্তক এবং রিপোর্তাজ বা সুপরিবেশিত সন্দেশ, একাধারে নিবন্ধ ও সমাজতাত্ত্বিক পূর্বাভাস। একমাত্র দার্শনিক অভিপ্রায় ছাড়া অন্যরূপে কবিতার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। (হয়তো তার প্রবেশ ঘটে যুক্তিসিদ্ধ কোনো জগৎদর্শনের একটা অত্যাবশ্যক উপাদানরূপে কিংবা তার একটা অর্থপূর্ণ উদাহরণ রূপে অথবা ব্যঞ্জনাময় উপমারূপে)। অতি অল্প-সংখ্যক আধুনিক কবিই বিস্তারিতভাবে বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ উল্লেখে উৎসাহী। কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নাই। যা আশ্চর্য ব্যাপার তা এই যে টেনিসন (Tennyson) বা লাফর্গের (Lafargue) মতো বিজ্ঞান যাঁদের কাছে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ভাবনার বিষয় কিংবা সার্বজনিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার্য, তাঁদের সংখ্যা মোটেই বাড়ে নি।

প্রায়ই আমরা এই মন্তব্য শুনি যে আগেকার দিনের বিজ্ঞান এখনকার চেয়ে অনেক বেশী সরল ছিল। এমনকি যিনি কবি তিনিও সহজেই ডারউইন তত্ত্বের আদি বিবরণ বুঝতে পারতেন। স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা হলে এই তত্ত্বের ঈশ্বরতত্ত্ববিরোধিতায় উৎফুল্ল হতেন, আর গোঁড়া ক্রীশ্চান হলে Origin of species 'নোয়ার আর্ক', নোহের তরী, এবং বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ের সৃষ্টি-তত্ত্বের যে ক্ষতি করেছিল সেই ক্ষতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে অশ্রুসজল চক্ষে অতীতের দিকে চেয়ে থাকতেন। ডারউইন তত্ত্বের যে ছবি একদা সারলো মনোহরণ ছিল সেই ছবিকে স্বাঙ্গীকরণ করতে হয়েছে বর্তমান কালের জননতত্ত্বের জটিল যুক্তিজালকে, আধুনিক শারীর-রসায়ন এমন কি আধুনিক জীব-সমাজ-তত্ত্বের (biosociology) সমস্ত জটিল সূত্রকে। বিজ্ঞান আজ বিশেষজ্ঞদের অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে গেছে। আমাদের বলা হচ্ছে যে আজকের দিনের সাহিত্যসাধকদের কাছে বিজ্ঞান বোধগম্যতার বাইরে চলে গেছে বলে তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি বর্জন করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। যদিও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদার্থজগতের সূক্ষ্ম সংগঠনের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করে চলেছে তবুও বিরাট দার্শনিক প্রশ্নগুলি—ভিন্ন আলোকে দেখা হলেও—চিরকাল যেমন ছিল তেমনি প্রকাণ্ড, তেমনি প্রকট, তেমনি অপরিহার্য রয়ে গেছে। ভিক্টোরীয় যুগে সে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই নখেদন্তে রুধিরাক্ত রয়ে গেছে প্রকৃতি—বরং আরও রক্তলোলুপা হয়েছে। "অসীম শূন্যতায় ধাবমান স্বয়ংদীপ্র পরমাণু প্রবাহের" বিষয়ে টেনিসনের সমকালীনদের চেয়ে আমরা অনেক বেশী জেনেছি, তবু এই পরমাণু-প্রবাহের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান স্রষ্টার বিষয়ে এঁদের অনেকে যতটুকু জানেন বলে বিশ্বাস করতেন তার চেয়ে অনেক কম জানি আমরা। এই নির্মন অসীমে শুধু

আমরাই কি 'মননের অধিকারী? ভিক্টোরীয় যুগের তুলনায় আমাদের হাতে এসেছে অনেক বেশী যুক্তি যার বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে সুদূর অন্যান্য সব সূর্যদের ঘিরে যে 'গ্রহ-উপগ্রহেরা' পরিক্রমারত তাদের মধ্যে অনেকে জীবনধারণের অনুকূল। শুধু মাত্র আমাদের এই ছায়াপথরূপ ব্রহ্মাণ্ডপল্লীতে এই সূর্যদের সংখ্যা সহস্র সহস্র কোটি। টেনিসন এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে এই সব সূর্যদের ঘিরে পরিক্রমারত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বল্পালোকিত পৃথিবীরা আমাদের এই পৃথিবীর মতোই বেদনার পৃথিবী।

তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নাই আমাদের। 'বেদনার' সঙ্গে 'সংবেদনের' ধাতুগত মিল আছে। দুঃখ দেহাশ্রিত সংবেদনের ফলশ্রুতি, সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের পরিণাম। ঘুরে ফিরে আমরা মননরূপ প্রশ্নটির কেন্দ্রটিতে হাজির হয়েছি। বিশ্বছবিতে চেতনার স্থানটা কোথায়? এই পৃথিবীর এবং আরো সব অন্যান্য ছোট ছোট স্বল্পালোকিত দুঃখ-সুখ-প্রেম-হতাশাময় ধরণীর মাত্রাস্পর্শ, অনুভূতি আর বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের বাদ দিয়ে কবিতা ও বিজ্ঞান তো দূরের কথা—এই অসীম শূন্যের কাজ চলে কী করে? আমরা কেউ যখন থাকবো না তখন এই নিখিল শূন্যের কেমন ভাবেই বা চলবে?

এরা থেকে যাবে সম্পূর্ণ একাকী
রূঢ় দৈনন্দিন, পরাবেদেরও অতীত,
এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্য যে
আমার থাকা না থাকায়
কিছুই যাবে আসবেনা এদের,
থাকবে আপন ব্যাপারে সম্পূর্ণ মগ্ন।
হায়, এরা এমন প্রতিদিনগত সত্য যে
এমন কাল সে আসতে পারে যখন

আদিম ধোঁয়ার আঁতুড়ের কাপড় জড়ানো
ভাসমান গ্রহে
চেতনার লেশমাত্র থাকবে না।
যখন তাদের সাজিতে সাজানো
ক্ষণপ্রভ মণিমাণিক্যের তাবিফ করতে
আমি থাকবো না,
তখনো এরা থাকবে আপন ব্যাপারে
আত্মমগ্ন।
সেদিনও এরা থাকবে
আপন ব্যাপারে মগ্ন
যেদিন আমার এই তুচ্ছ নামের আশ্রয়ে
নির্বোধ একটা অস্তিত্বের খোলে
তুচ্ছ এক বোহেমিয়ান ঝোঁক
আর আত্মপ্রকাশ করবে না। (৪২)

কী হলো, আর কী হওয়া উচিত ছিল এই প্রশ্ন, মানুষের উচ্চাশা আর প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ কতটুকু এই প্রশ্ন, ইত্যাদি যে প্রশ্ন আজ থেকে তিনচার প্রজন্মপূর্বে বিজ্ঞান উত্থাপন করেছে তারা আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে। আর, যাঁরা বিজ্ঞানের দর্শন রচনায় ব্যাপৃত তাঁরা এই সব প্রশ্নের একটা গ্রাহ্য মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হায়, এ ব্যাপারে কবিদের কোনো আকর্ষণই নাই।

তেইশ

এবার আমরা কবিদের প্রসঙ্গ ছেড়ে নাট্যকারদের প্রসঙ্গে আসছি। নাট্যকারদের বিজ্ঞানপ্রীতি কতটা গভীর? নাটকের কাজ মানুষের চিত্তের উত্তালতম আবেগকে প্রকাশ্যে উদ্বোধিত করে তার প্রশমন বা নিরসন। নাটকের মৌলিক বিষয়বস্তু দ্বন্দ্ব—একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কিংবা একদিকে আবেগচালিত ব্যক্তি আর অপরপক্ষে দুরতিক্রম্য সামাজিক বিবেকবোধ এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমাদের ব্যক্তিচেতনা-উদ্ভূত অনুভবের মধ্যে যে প্রবল অনুভবগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ আমাদের উপর তাদের প্রভাবই বেশী। যে শিল্পসৃষ্টিগুলি আমাদের মধ্যে এই ধরনের অনুভবের উদ্রেক করে তারাই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও জনপ্রিয়। নিকৃষ্ট উত্তেজক শিল্পকৃতি সব সময়েই বেশীর ভাগ মানুষের তৃপ্তির উপকরণ। আবও পরিশীলিত যাঁরা তাঁরা চান সূক্ষ্মতর, সমৃদ্ধতর ও অধিকতর পরিশীলিত উদ্দীপক বস্তু। কিন্তু এঁরা সংখ্যালঘু। আজকের দিনের বেশীর ভাগ মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনার খোরাক সংগ্রহ করেন 'অপরাধী কে?'-ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী কিংবা জনরঞ্জক সংবাদপত্র থেকে। সংখ্যাগুরুদের প্রিয় সংবাদপত্রের বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে থাকে পাশবিক অপরাধের বিবরণ কিংবা শিরোনামাজোড়া যৌন কেচ্ছা-কাহিনী। সংখ্যালঘুরা এই দেখে মর্মাহত। কিন্তু মানুষ প্রথম যেদিন পাশবপ্রবৃত্তিজাত অপরাধ ও যৌনকুৎসার কাহিনী আবিষ্কার করেছে সেই দিন থেকেই এসব কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মহান নাটকের গল্পাংশ থেকে যদি

কাব্যরসকে নিঙড়ে বের করে নেওয়া হয় তাহলে যা পড়ে থাকবে তা প্রকৃতিতে পুলিশ গেজেটের প্রথম পৃষ্ঠার সমাচার।

বীররসাত্মক বিয়োগান্ত নাটক এবং নিম্নরুচির সাংবাদিকতা উভয়ের মধ্যেই নিরুত্তাপ পর্যবেক্ষণের স্থান নাই। স্থান নাই সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসজ্জার কিংবা যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার।

মনুষ্যজাতির অমীমাংসিত অন্তর্বিপ্লব- যুক্তির আর প্রবৃত্তির মধ্যে নিত্যসংঘটিত যুদ্ধ, যুক্তি আর প্রবল বাসনার মধ্যে সংগ্রাম, সত্যবোধ ও যুক্তিবদ্ধ অযৌক্তিকতার মধ্যে বিরোধ, একদিকে শিক্ষিত স্বার্থবোধের ছদ্মবেশপরিহিত যুক্তি আর অপরদিকে আদর্শবাদ দিয়ে শোধনকরা, ধর্মনীতি ও সমাজবিধিরূপে সংঘবদ্ধ অপরাধপ্রবণ উন্মত্ততা, এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম,—এই সব অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের মধ্যেই এই অসঙ্গতি প্রতিবিম্বিত। যুগযুগান্তর ধরে এই অন্তর্বিগ্রহ একই রকম থেকে গেছে যদিও পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এর বহিঃপ্রকাশ পরিবর্তিত হয়েছে। তাই তথাকথিত 'বিশ্বাসের যুগে' (Age of Faith) বহুবিঘোষিত খ্রীষ্টধর্মাশ্রিত সমিতির (units) সারতত্ত্ব--সারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বে পরস্পরের কণ্ঠনালীচ্ছেদনের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস দিয়ে কলঙ্কিত হয়েছে। আজকের দিনে, তথাকথিত লৌহ-যবনিকার দুধারেই আমরা মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী (humanist)। আমাদের এই যুগটা 'কল্যাণ রাষ্ট্রের' যুগ, আর একই সঙ্গে বন্দীশিবিরের যুগ, সর্বধ্বংসী বোমাবর্ষণ আর তেজস্ক্রিয় অস্ত্রসজ্জারও যুগ। আর ধারণার স্তরে, আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগ শুদ্ধবিজ্ঞানের যুগ, বিশ্লেষণমূলক দর্শনের যুগ আর যুগপৎ পৌত্তলিকজাতীয়তার যুগ, সুপরিকল্পিত অনৃতভাষণের এবং বিরতিহীন চিত্তবিভ্রম বা চিত্তের 'ইতোনষ্টঃততঃ ভ্রষ্ট'তার যুগ।

এটা সুস্পষ্ট ;
পাঠশালার প্রত্যেক পড়ুয়ার এটা জানা :
লক্ষ্যগুলো বানরের
শুধু উপায়গুলো মানুষের।
পাপিয়োর (Papio) কুট্টনী,
বেবুনদের কোষাধ্যক্ষ,
যুক্তি ছুটি আসে হন্তদন্ত, কৃতকর্মকে বিধিভুক্ত করতে···
হাতে নিয়ে আসে 'ক্যালকুলাস' তোমার রকেটগুলোর
নির্ভুল ভাবে তাক ঠিক করে দিতে
সমুদ্রপারের অনাথ আশ্রমের দিকে ;
লক্ষ্য ঠিক ক'রে ধূপোপচার নিয়ে
বৃহৎ কামানরূপী যে 'মাতৃদেবী (Our Lady)
আসে তার উপাসনায়,
প্রার্থনা তার
লক্ষ্য 'পরে নির্ভুল আঘাত! (৪৩)

এই গৃহযুদ্ধে সাহিত্যশিল্পী তাঁর বিশেষ প্রতিভার বলে দুটো প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখেন। একটা ভূমিকা এই যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতার ভূমিকা। আর একটা ভূমিকা প্রচারকের। সাহিত্যশিল্পী পেশায় মানুষের অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত অনুভূতির লিপিকার। তাই তিনি 'অযুক্তি'র সমস্ত প্রকার প্রকাশকে—সে প্রকাশ হিতকর হোক অহিতকর হোক, মননসিদ্ধ হোক বা রূঢ় প্রত্যক্ষ হোক—সমস্ত প্রকার প্রকাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সংঘবদ্ধ সমাজের সার্বজনিক জীবনের সঙ্গে, আর বিশেষ বিশেষ দর্শনশাস্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে এই প্রকাশগুলি কী ভাবে সম্পর্কিত তা তিনি সহজেই বুঝতে পারেন। তাছাড়া শব্দশোধনের বিশেষ ক্ষমতায় অধিকারী বলে দুই বিবদমান

শিবিরের হয়ে প্রচারকের কাজ করা তাঁব পক্ষে সম্ভব। তিনি কি ভব্যতা বজায় রাখাব জন্যে যুক্তির পক্ষ অবলম্বন করবেন? কিংবা অন্তঃস্থ বেবুনের কার্য্যকলাপেব স্বপক্ষে যুক্তি নির্মাণ করবেন? তিনি কী তাঁর প্রতিভাকে আবো জীবন, আবো প্রেম, আরো স্বাধীনতার স্বপক্ষে ব্যবহাব কববেন? কিংবা

'দর্শনেব পিছু পিছু চ'লে তাব অপান বায়ু ধাবণ কববেন,
অত্যাচাবীদেব পদলেহন কবতে কবতে চলবেন, কিংবা
আসবেন প্রুশিয়াব পক্ষে গণিকাব রূপে
হেগেল (Hegel)-এব ছেঁদো ইতিহাসখানা নিয়ে?' (৪৪)

নিজেব খুশীমতো তিনি বেছে নিতে পাবেন। যা সবাই পাবে না। বেশীব ভাগ মানুষ সামাজিক সংগঠনেব জালে এমন ভাবে বাঁধা যে এই জাল থেকে বেবিয়ে পালাবার ক্ষমতা নাই তাদেব।

এটা একটা স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য যে বহু লেখক ভুল পথ বেছে নিয়েছেন। স্থূলক্ষমতাব হাতে, সংঘবদ্ধ স্বার্থেব হাতে আব তর্কদিয়েসিদ্ধ 'অযুক্তি'ব হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে প্রতিভা আর খ্যাতি। ইয়েট্সেব (Yeats) মৃত্যু উপলক্ষ্যে বচিত "যুগ" (Time) কবিতায় কবি অডেন (Auden) লিখেছেন:

যে যুগ সাহস আব সবলতাব প্রতি অসহিষ্ণু,
পক্ষকাল যেতে না যেতেই
সুন্দব দেহেব প্রতি বীতবাগ।
যে যুগ পুজো কবে বচনকে,
ক্ষমা করে তাদেব সবাইকে
যাদেব দৌলতে সে বাঁচে;
ক্ষমা কবে কাপুরুষতাকে

ভীরুতাকে এবং অহমিকাকে,
এদের পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দেয়।
এই যুগ তার উদ্ভট ক্ষমায়
ক্ষমা করেছে কিপ্লিংকে
আর তার মতাদর্শকে,
তেমনি এ ক্ষমা করবে
পল ক্লদেলকে
তাঁর রচনার বম্যতার জন্যে (৪৫)

উত্তেজক সংবাদপত্রের লোমহর্ষক কাহিনী দিয়ে ঠাসা 'হ্যামলেট' (Hamlet) ও 'আগামেমনন' (Agamemnon) নাটক। কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়র ও ইস্‌কাইলাস (Aeschylus) উভয়েই নিজ নিজ গোষ্ঠীর শব্দে শুদ্ধতর ব্যঞ্জনা আরোপ করেছেন। তাই এই বীভৎসতা সত্ত্বেও তাঁদেরকে আমরা মার্জনা করি, আর ঐ সব আশ্চর্য কথা শুনতে শুনতে নরহত্যা আর যৌনকুৎসাজাত উচ্চণ্ড আবেগকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার অপরাধের জন্যে নিজেদেরকেও মার্জনা করি।

বিজ্ঞানের ভিত্তি নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষণ, নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি ও পরীক্ষা, আর যুক্তিদিয়েবাঁধা ধারণাকলাপের সীমার মধ্যে আবদ্ধ অধ্যবসায়ী বিচার। যে দ্বন্দ্ব লৌকিক জীবনে যুক্তি আর প্রবৃত্তির মধ্যে নিত্য সংঘটিত সেই দ্বন্দ্বে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। কাম ও কুসংস্কার সব সময় তাদের ছত্রভঙ্গ শক্তিকে অতিদ্রুত সংহত করে দুঃসহ কোপে আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু পরিণামে (কিন্তু হায়, অনেক সময় প্রায় অন্তিম কালে!) জ্ঞানপ্রেরিত স্বার্থবোধ জাগ্রত হয়ে যুক্তির জয় ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু নাটকের কল্পিত জগতে এ ধরনের জয়ের নিশ্চয়তা খুবই কম। প্রথমত, আমরা যখন বিয়োগান্ত নাটক দেখতে যাই আমরা তখন উত্তেজিত হবার জন্যই যাই, পাপ

আর যৌনকুৎসার সঙ্গে জড়িত প্রবল আবেগকে পরোক্ষভাবে আস্বাদন করতেই যাই। নাটকে যদি কখনো যুক্তি বা নির্লিপ্ত জ্ঞানময়তার (awareness) কথা ওঠে, যদি কোথাও তথ্য হিসেবে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ওঠে, যদিবা কোথাও তত্ত্বরূপ বিজ্ঞান বা কোনো প্রচলিত দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ যে বিজ্ঞান তার উল্লেখ ঘটে, তখন তা ওঠে বা ঘটে আবেগজাগানো দ্বন্দ্ব কাহিনীর মূল ধারা থেকে বিচ্যুত প্রসঙ্গ রূপে। রঙ্গ এক ব্যাপার আর কাহিনী বলার কলা আর নাটকীয় ভাবে চরিত্রবর্ণনার কলা আর-এক ব্যাপার। বিয়োগান্ত নাটকের রচয়িতার হাতে সময় সীমিত, তাঁর নাটকের শ্রোতাদের সময় আরও সীমিত, তাই উচ্চাঙ্গ নাটকে মূললক্ষ্য যে আবেগউৎসারী ঘটনার বিবৃতি তার থেকে সরে সাময়িক ভাবে হলেও বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ বিরক্তিকর।

অপর পক্ষে কৌতুকনাটকের যে দ্বন্দ্ব তা' নিরসনের অতীত নয়। তাছাড়া, এই সব নাটক যে সব রসের সৃষ্টি করে তারা ট্রাজেডির রসের মতো ভীষণ নয়। ফলে, কৌতুকনাটকে প্রসঙ্গ-বিচ্যুতি (digression) ততটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। শ্রোতারা বরং এই সব অবান্তর প্রসঙ্গ ধৈর্য্য ধরে শোনে, এমন কি সময়ে সময়ে তা রীতিমতো উপভোগও করে। নাটকের মধ্যে অবান্তর নাটকীয়তা আমদানীর কৌশলী শিল্পী বার্নার্ড শ (Bernard Shaw) বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে শ ডারউইনপন্থী জীববিদ্যা সম্বন্ধে প্রচুর প্রগল্ভ বাগ্‌বিস্তার করেছেন এবং তাঁর Black Girl নাটকে পাভলভীয় রীতির (Pavlovian) শরীরাশ্রিত-মনোবিদ্যা (Psycho-physiology) সম্পর্কে অনেক আবোল তাবোল বকেছেন)।

চব্বিশ

কৌতুক নাটক অতিবিক্ত কথোপকথনবহুল হতেও পাবে। তবু এই ধবণেব আলাপবহুল নাটকও যে পবিমাণ অবাস্তব বিষয় ববদাস্ত কবে তাব চেয়ে অনেক বেশী পবিমাণ অবাস্তব বিষয় স্থান পায় উপন্যাসে ও প্রবন্ধে। বচনা যদি প্রসাদগুণ সম্পন্ন হয়, তাহ'লে প্রায় যে কোনো বিষয়ই নিবন্ধে স্থান পেতে পাবে। আব, কার্যতঃ সমস্ত কিছুই উপন্যাসে স্থান পেতে পাবে, তা' তীব্রতম ব্যক্তিগত অনুভবই হোক বা সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ বা যুক্তিই হোক। অর্থাৎ কবিতা ও বিয়োগান্ত নাটকে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গে উল্লেখেব অবকাশ খুবই কম। কৌতুকনাট্যে আবো একটু বেশী; তবু একটা প্রবন্ধ বা তিনশো পাতাব উপন্যাসে যতটা অবকাশ .তাব চেয়ে কম।

সাহিত্যে বিজ্ঞান আলোচনাব ইতিহাস নিয়ে একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখাব প্রয়োজন দেখিনা এবং তা লেখাব যোগ্যতাও আমাব নাই। তাছাড়া অতীত নিয়ে আমাদেব মাথাব্যথা নাই। আমাদেব প্রধান ভাবনা এই বর্তমান ও আশু ভবিষ্যৎকে ঘিবে। আমরা পছন্দ কবি বা না কবি আমাদেব এই যুগ বিজ্ঞানেব যুগ। এই যখন অবস্থা তখন লেখকেব কবণীয় কী?

আর, বিবেকবান সাহিত্যশিল্পীরূপে কিংবা দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে কীই বা তাঁব কর্তব্য? লেখক মাত্রেবই প্রধান ও প্রথম কর্তব্য যে প্রতিভায় তিনি অনন্য সেই প্রতিভাকে বচনায় চূড়ান্ত ভাবে ব্যবহাব কবা অর্থাৎ তাঁব নিজের ও অপরের অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত সংবেদকে তাঁর গোষ্ঠীব প্রচলিত ভাষার চেয়ে শুদ্ধতর

ভাষায় প্রকাশ কবা। তাঁব কর্তব্য এই সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রাকৃত জগতেব তথ্য, শব্দরূপ প্রতীক° আব প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিধিব সঙ্গে যুক্ত কবে দেওয়া। তাঁব কর্তব্য, যে সমস্ত লোকে নিয়তিব বিধানে মানুষকে বাঁচতে হয়, মবতে হয়, যে ভুবনে তাব অনুভব, তাব মাত্রাস্পর্শ, তাব চিন্তাব বিলাস সেই সমস্ত ভুবনেব সঙ্গে মানুষেব অস্তিত্বকে সাধ্যমতো ভালভাবে খাপ খাইয়ে দেওয়া। সাহিত্য জীবনকে আকাব দেয়। আমবা কী ও কে, আমবা কেমন কবে অনুভব কবি, আব বাঁচাব মতো এই অকথ্য কিম্ভুতকিমাকাব ব্যাপাবেব কীই বা অর্থ তাব হদিস দেয় সাহিত্য। বলতে গেলে, আমাদেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদেব মনোমত শিল্পেব অতসীকাচেব ভিতব দিয়ে আমাদেব কাছে পৌঁছয়। তাই এই শিল্প যদি অযোগ্য হয়, অকিঞ্চিৎকব হয় বা অত্যুগ্র হয় তাহ'লে আমাদেব অনুভূতিব আভিজাত্য বিনষ্ট হয় ও তা বিকৃত হয়। অপকৃষ্ট সাহিত্য অসত্য দর্শন ও ধর্মীয় কুসংস্কাবেব মতোই সমাজবিবোধিতাব অপবাধে অপবাধী।

যাবা স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)-এব বোগী অর্থাৎ যাদেব ব্যক্তিত্ব ভেঙে টুক্‌বো হয়ে গেছে শুধু তাবাই বাস কবে নিজেদেব একান্ত অনুভবেব জগতে। কিন্তু সুস্থ যাবা তাবা তাদেব অন্তবঙ্গ জগৎকে উপলব্ধি কবে সার্বজনিক অভিজ্ঞতাব জগতেব পবিপ্রেক্ষিতে, অন্ততঃ সার্বজনিক জগতেব পটভূমিকাতেই তাকে বিচাব কবে। বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিক জগতেব বৃহৎ বৃহৎ অংশেব মানচিত্র তৈরি কবেছেন এবং এদেব সুসংবদ্ধ বিববণও তৈবী কবেছেন। এবং তা কবেছেন পাবমাণবিক স্তব থেকে জৈব তথা মনস্তাত্ত্বিক স্তব পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন, সাহিত্যশিল্পীবা এই বৈজ্ঞানিক স্তবপরম্পবাব সঙ্গে কী ভাবে নিজেদের যুক্ত কববেন?

সাহিত্য ও বিজ্ঞানেব মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপনেব জন্য যা

প্রথমেই প্রয়োজন তা' বিদ্যা। লেখকের মুখ্য উপকরণ অপেক্ষাকৃত মার্জিত শব্দ ও মানুষের অপেক্ষাকৃত নিজস্ব অভিজ্ঞতা। তবু তাঁকেও আর এক শ্রেণীর মানুষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে 'জানতে হবে।' এই পরবর্তী শ্রেণীর মানুষেরা অপেক্ষাকৃত সার্বজনিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে তার ফলাফলকে কতকগুলি ধারণাকলাপে সুসজ্জিত করার কাজ গ্রহণ করেছেন। এই কাজ তাঁরা অবশ্য আর এক জগতের মার্জিত শব্দের আশ্রয়ে সাধিত করেন। তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ সংজ্ঞাদ্বারা সুনির্দিষ্ট এবং যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার উপাদান। বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যের পক্ষে যেরে ান বিজ্ঞানশাখার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অসম্ভব এবং অপ্রযোজনীযও বটে। সাহিত্যসাধকের যা প্রযোজন তা বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান, বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখায মার্জিত জ্ঞানের একটা সমন্তদৃষ্টি (birds'eye view), আর এই সঙ্গে তাঁকে বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে কী ভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিন্তাধারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্ম, রাজনীতি ও সমর্থনীয জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর এটা বলাই বাহুল্য যে এই দুটো জীবনদর্শনের (কৃষ্টি) মধ্যে বোঝাপড়া হবে পারস্পরিক। বিজ্ঞানের দিক থেকে সাহিত্যের দিকে এবং সাহিত্যের দিক থেকে বিজ্ঞানের দিকে, এই উভয দিকেই এই পারস্পরিক আদানপ্রদান চলতে থাকবে। ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) বলেছেন "পণ্ডিতমূঢ়দের (Savants betes) বিজ্ঞানে আমার আস্থা খুবই অল্প।" তাঁর সন্দেহ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু এ সন্দেহ যুক্তিযুক্ত নয। পণ্ডিতমূঢ়দের সংখ্যা খুবই বেশী, আর এ সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ইসরাইলের (Israel) ভাইজম্যান Weizmann Institute-এর ডঃ জে, গিলস্ (Dr. J. Gills) এই প্রসঙ্গে বলেছেন: ঘটনা হিসাবে যা সত্য তাকে স্বীকার করতেই হবে। আজকের দিনে বহুসংখ্যক তরুণ বৈজ্ঞানিক

গবেষণাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করে এবং এটা আফসোসের কথা যে তাদের মধ্যে অতি অল্পজনই প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী : এদের বেশীর ভাগের কাছেই একাজ অন্য কাজের মতোই। তাছাড়া এইসব মাঝারি বুদ্ধির গবেষকদের কতটা ক্ষমতা তা সাধারণভাবে বিদগ্ধ আকাদামীর বাইরের লোকেরা যথার্থ পরিমাপ করতে পারেন না। একমাত্র গণিতের ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সব বিজ্ঞান-ক্ষেত্রেই গবেষণা একার কাজ নয়, তা দলগত। আর, কোনো বিশেষ গবেষক দলের মধ্যে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের তারতম্য উগ্রভাবে প্রকট নয়। যদি কারো উপরের নির্দেশ যথাযথ পালন করার বুদ্ধি থাকে আর তার সঙ্গে সময়মতো কাজে হাজিরা দিয়ে সততার সঙ্গে সেই কাজটা নিষ্পন্ন করার প্রবৃত্তি থাকে, তা হ'লে তার পক্ষে একই সঙ্গে উচ্চপদে আসীন থাকা ও বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোজন করা সম্ভব।

ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে তাঁরা অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চরিত্রের কঠোরতা এবং অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী! এঁরা তাঁদের যোগ্যতার পরিমাপে সাফল্য লাভ করেন। এঁদের পরের সারিতে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশীর ভাগ কোনো রকমে কার্যসিদ্ধি করে চলেন। তারও পরের সারিতে যাঁরা তাঁরা, সেই সংখ্যালঘুবদল, সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম বৈজ্ঞানিকেরা সংখ্যায় এদের চেয়ে সম্ভবতঃ কম। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগাছা বিতাড়নের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তার কার্যকারিতাও কম। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিদের কাছে বৈজ্ঞানিকগবেষণাগত রোমানস্ বা রম্যরসের যতটা আকর্ষণ, মধ্যমবুদ্ধিদের কাছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগত পেশার আকর্ষণ তারচেয়ে বেশী। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণাব্যাপৃত এই বিপুলসংখ্যক বুদ্ধিজীবী প্রলেটারিয়েট বা বুদ্ধির মজুরদল ছাড়া আমাদের চলবেই বা কী ক'রে? এক শতাব্দী পূর্বে সংখ্যায় এই

বুদ্ধির মজুররা আজকের দিনে তাদের যে সংখ্যা তার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র ছিল। তবু সেদিনও তারা সংখ্যায় ভিক্টর হুগোর মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। "Choses vues" ('যা দেখতে পাচ্ছি') শিরোনামার রচনার লেখক, সাংবাদিকতার পরাকাষ্ঠার এই প্রতিভূ, "পণ্ডিত মূঢ়" গোষ্ঠীব উদ্ভবকে আধুনিক সমাজজীবনের একটা ঘটনারূপে স্পষ্টই চিনেছিলেন। আর, দার্শনিকে রূপান্তরিত কবি এইসব মূঢ়দের আবিষ্কৃত তথ্যেব সত্যতায় বিশ্বাস করতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে সমাজে এই বিশেষ শ্রেণীব উদ্ভবের প্রতি তাঁর বিরাগকে প্রকাশ করেছেন। আমবা যারা এই বুদ্ধির মজুরদের বিস্ফোরণেব মতো বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির সমকালীন তারা এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি সাংবাদিকেব তারিফ কবতে পারি ও কবি-দার্শনিকের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করতে পারি। কিন্তু আমরা বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার বিপুল প্রসারের কালে বাস করছি বলে আমাদের এটা স্বীকাব করতেই হবে যে কবিদার্শনিকের এই সংশয় আপাতবোধগম্য হলেও মূলতঃ অযৌক্তিক। ভিকটর হুগো (Victor Hugo) বিশ্বাস করতেন যে সৃজনশীল প্রতিভা চারুকলার ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তেমনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও।

এটা এখনো পর্যন্ত সত্য যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কাব অসাধারণ ব্যক্তিদেব কীর্তি। কিন্তু অভিনব আবিষ্কারের ক্ষেত্রকে সংহত করতে হবে এবং তাকে প্রসারিত করতে হবে। এই কাজের জন্য মানসিক শ্রমিক বাহিনীর বা বুদ্ধির মজুর বাহিনীব প্রয়োজন। এবা যদি বৈজ্ঞানিক "ক্রীড়ার" বিধিনিয়ম যথাযথ পালন করে, তাহলে তারাও এর উৎকর্ষের সহায় হয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে, বিজ্ঞান এমন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে যে পদ্ধতি তার প্রয়োগ কর্তার অপেক্ষা রাখে না।

যে সব নরনারীর যথাযথ আদেশ পালন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ও যথাসময়ে কাজে হাজিরা দেওয়ার মতো আসক্তি আছে তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শুধু যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করতে পারে তাই নয়, তারা এই জ্ঞানকে প্রসারিত করতে পারে। গবেষণায় নিযুক্ত এই সব বুদ্ধির মজুররা "পণ্ডিতমূঢ়"। অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে যারা সাফল্য লাভ করেছেন তাদের কাহিনীর চেয়ে এঁদের কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক। যে পদ্ধতি এঁরা প্রয়োগ করেন সেই পদ্ধতিটাই ব্যক্তিগত প্রতিভার অভাবকে পর্যাপ্তরূপে পূরণ করতে সমর্থ।

পঁচিশ

সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা সবচেয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বিদ্যা। গণিতের ভাষায় একে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু এই বিজ্ঞানশাখা আমাদের অব্যবহিত অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে দূরে। লেখকের মতে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা যে বিশেষ কারণে চিত্তাকর্ষক তা তার বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক মনন একরাশি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা থেকে পর্যবেক্ষণের অতীত আর একরাশি কল্পিত বস্তুতে উপনীত হয়ে পুনরায় নতুন আর একরাশি ইন্দ্রিয়ছবিতে ফিরে আসে এবং এদের পরিপ্রেক্ষিতে পারমাণবিক তত্ত্বের কার্য্যকারিতা প্রমাণিত করে। বিখ্যাত পদার্থবিদ ভেরনের হাইজেনবের্গ-এর (Werner Heisenberg) ভাষায়ঃ "মানুষ তার লৌকিক ইতিহাসে এই প্রথম আবিষ্কার করেছে যে সে একাকী, তার সাথী সে নিজেই, তার না আছে কোনো সরিক না আছে কোনো প্রতিপক্ষ।" আরও চিত্রময়ী ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়; "কালক্রমে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, নিজেই নিজের প্রণয়বিধাতা, নিজেই নিজের মোক্ষদাতা আর নিজেই নিজের উৎপীড়নকারী মঙ্গলগ্রহআগত কল্পিত দস্যুতে পরিণত হতে চলেছে।" শুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সে এই একই আবিষ্কারের সম্মুখীন হচ্ছে যে সে নিজেই নিজের একমাত্র সঙ্গী। ক্রমাগত সে বস্তুর বিশ্লেষণকে যতই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে চলেছে ততই সে এই আবিষ্কারের নিকটবর্তী হচ্ছে। হাইজেনবের্গ বলেছেন ঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে পদার্থের যে নির্মাণ-উপাদানগুলিকে প্রথমে চরম বাস্তব তত্ত্ব ব'লে স্বীকার

করা হয়েছিল সেই উপাদানগুলিকে আর আমরা "বস্তু-তন্মাত্র" রূপে গ্রহণ করতে পারিনা। পরমাণু এবং তাদের "গতি-তন্মাত্র" (movements in themselves) অর্থাৎ আমাদের পর্যবেক্ষণ-নিরপেক্ষ যে তন্মাত্র, এরা আর গবেষণার লক্ষ্য নাই। বরং একথা বলা যায় যে প্রথম থেকেই আমরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক সংলাপের সম্মুখীন। এই দ্বিপাক্ষিক সংলাপের একপক্ষ মাত্র বিজ্ঞান। ফলে, জগতকে নাম ও রূপের দ্বৈতে, অন্তরজগৎ ও বহির্জগতের দ্বন্দ্বে, বা আত্মা ও দেহের বিরুদ্ধ যুগ্মে বিবিক্তিকরণ আর সিদ্ধ নয়। বরং এই দ্বন্দ্বরূপের কল্পনা সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তু আজ আর স্বয়ংসিদ্ধ প্রকৃতি নয়। আজকের বিষয়বস্তু সেই প্রকৃতি যা মানুষের প্রশ্নের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ঘুরেফিরে মানুষ নিজেই নিজের সম্মুখীন হোলো। সাহিত্যশিল্পী মানুষের অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত সংবেদ নিয়ে ব্যাপৃত, তাই নামরূপ, আন্তর ও বাহ্যরূপের দ্বন্দ্বের বিলোপ কাহিনী তাঁর কানে খুব চেনা বলে বাজে। তাঁর মনে পড়ে কবিদের ও যোগীদের কোনো কোনো বাণী। মানুষের সার্বজনিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণকে অন্ততঃ তত্ত্বের দিক থেকে যদি যথেষ্ট দূর পর্যন্ত টানা যায়, তাহ'লে সেই একই সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হবে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গূঢ়তম অনুভব, ধ্যান, সমাধি বা 'সাতোরি'তে।

ছাব্বিশ

সাতোরি (satori), সমাধি, ধ্যান এই কথাগুলিকে কেন্দ্র করে কতই না সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রশ্ন গুচ্ছ বেঁধে রয়েছে ! এখন প্রশ্ন : যে অভিজ্ঞতাকে প্রাচীন কাব্যময় স্ববিরোধী কথার মালা দিয়ে কিংবা আধুনিকতম স্নায়ুনিদান তত্ত্ব দিয়ে, জাপানী জেন (Zen) দর্শন দিয়ে বা সাইলোসাইবিন (Psilocybin) দিয়ে, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র দিয়ে কিংবা অমুক মানসিক হাসপাতালের তমুক ডাক্তারের মত দিয়ে সমান ভাবে বর্ণনা করা যায়, তাকে প্রকাশ করতে কী ধরনের পরিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজন ? পুনরাবৃত্তিহীন অনন্য অভিজ্ঞতার প্রকাশ হবে কী ভাবে ? সাহিত্যের ব্যঞ্জনাবহুল পরিমার্জিত শব্দ দিয়ে কিংবা সেই ভাষায় যে ভাষায় শব্দের একটাই মাত্র অর্থ, যে ভাষায় শব্দেরা নানান ঘটনার সামান্য লক্ষণ বা বহু অভিজ্ঞতার সাধারণ উপাদান বা প্রত্যক্ষ ব্যবহারের একটা গড় ধারণা মাত্র ? যে সাহিত্য শিল্পী সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞানক্ষেত্রের চুম্বক জ্ঞান আয়ত্ত করছেন ও ভাষার উপর যাঁর প্রভুত্ব অসাধারণ তিনি নিঃসন্দেহে এই দুটো জগতের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তার ব্যবহার করতে পারেন। এই দুই জগতের মাঝখানে আছে লৌহ যবনিকা। এই যবনিকার অপর পারে বিজ্ঞানীরা যখন এই সমস্যা নিয়ে বিচার করতে বসবেন তখন এই দুটো জগতের যা উৎকৃষ্ট তাকে ব্যবহার করার উপায় তাঁদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিকের (এদের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে) বিশেষ করে বুদ্ধির মজুরীতে নিযুক্ত পণ্ডিতমূঢ়দের ধারণা এই যে, "অব্যতিরেকী" (nothing but) অর্থাৎ "এছাড়া অন্যকিছু নয়"

এই ন্যায়ে বাঁধা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব আর যথার্থ অভিজ্ঞতা-নির্ভর এবং "শুধুমাত্র এই নয় অন্যটাও" এই ন্যায় আশ্রিত তত্ত্ব, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে বুঝি প্রথমটাই অধিকতর বৈজ্ঞানিক। উদাহরণ স্বরূপ, সাইলোসাইবিনকে (Psilocybin) 'মানস প্রক্রিয়া অনুকারী' পদার্থরূপে গ্রহণ করাকে, আর এই সামগ্রী যে সমস্ত অনুভূতির উদ্রেক করে তাদের স্বীকৃত পাগলদের অনুভূতির সমপর্যায়ের বলে গ্রহণ করার ব্যাপারকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক বলে মানা হয়।

অপরপক্ষে যদি কেউ এই দ্রব্যটিকে "আত্মা প্রকটকারী" (Psychodelic) বস্তুরূপ বর্ণনা করে, এবং এই রকম কোনো ইঙ্গিত করে যে বেশীর ভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দ্রব্যের প্রভাবে যে অভিজ্ঞতা জন্মে সেই অভিজ্ঞতা প্রকৃতিতে মহান এমনকি অনেক সময় আত্মজ্ঞানের ও চরিত্র রূপান্তরের সহায়, তাহলে বিপজ্জনক অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ উঠবে। যদি এই "পণ্ডিতমূঢ়দের" কোনো কবি থাকতেন তাহলে তিনি এদের লক্ষ্য করে বলতেন; "সব চেয়ে নিকৃষ্ট যা তা যদি চোখে দেখি তাহলে তাকে আমাদের ভালবাসতে হবে।" আর এই প্রত্যক্ষ নিকৃষ্ট ছাড়া অন্য সব কিছুর দিকে আমাদের সযত্নে চক্ষু মুদে থাকতে হবে। যে ধীমান বৈজ্ঞানিক নিজের ব্যক্তিগত সংবেদ ও অন্যদের লিখিত সংবেদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আর যে ধীমান সাহিত্যিক সার্বজনিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, উভয়েই পরস্পরের মধ্যে মতের মিল খুঁজে পাবেন এবং উভয়ে মিলে একটা নূতন ব্যাপক দর্শন সৃষ্টি করবেন। এই দর্শন প্রতিপন্ন করবে যে যা উচ্চস্থ তা নীচস্থে পরিণত হতে পারে আবার তেমনি যা নীচস্থ তা উচ্চতর স্তরে আবির্ভূত হতে পারে। এই দর্শনে তথ্যদের বিশ্লেষণ ও তাদের শ্রেণীবিভাগের স্থানে থাকবে সত্য, কিন্তু এই বিশ্লেষণ

ও শ্রেণীবিভাগকে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হবে না। এই দর্শন আরো প্রতিপন্ন করবে যে; বিজ্ঞান যা বলে বলুক, আমাদের অপরিস্রুত ভাষার শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ এবং অন্বয়পদ্ধতি দিয়ে নির্ধারিত তথাকথিত "সাধারণজ্ঞানে" যা বলে বলুক, যা সৎ তার না আছে ভাগ, না আছে কোনো সন্ধিরেখা।

সাতাশ

এটা স্পষ্ট যে পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন বিদ্যার মতো নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানের চেয়ে জীববিদ্যা আমাদের মানবিক সংবেদের অনেক কাছাকাছি। এই কারণেই প্রত্যেক লেখকের কাছে এর বিশেষ মূল্য। জীবনসম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানকে দৃঢ়তর করে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করে এবং তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সীমানাকে বিস্তৃত করে। অধ্যাপক মাসলো (Maslow) লিখেছেন : "লেখক, অধ্যাত্ম বা সমাজজীবনের নেতা, এঁরা সকলেই আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন, দুঃসাহসী তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারেন আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভুল ও সত্যদর্শী হতে পারেন।

তবু তাঁরা নিজেরা যতই স্থিরনিশ্চয় হোন না কেন সমস্ত মানবজাতিকে স্থিরপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। বিজ্ঞান হোলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা সত্যকে অনিচ্ছুক কণ্ঠনালী দিয়ে ঠেলে দেওয়া যায়। একমাত্র বিজ্ঞানই মানুষের দর্শন ও প্রকৃতির চরিত্রনির্ভর বিভিন্নতাকে দূর করতে পারে। একমাত্র বিজ্ঞানই এগিয়ে যেতে পারে।"

জীবনভিত্তিক বিজ্ঞান কবির বা শিল্পীর স্বতোৎসারিত জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। অপর পক্ষে তেমনি বিজ্ঞান শিল্পীকে তাঁর সৃজনীশক্তি ব্যবহারের উপাদান জোগান দেয় বলে শিল্পীকেও বিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখতে হয়। আর, চার বা পাঁচটা পৃথক পৃথক জগতে যুগপৎ বিহাররত প্রাণীদের সমাজ যে মানবজাতি সেই মানবজাতির এমন একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে যে সমন্বয় সাধন একমাত্র কবির পক্ষেই সম্ভব "তাঁর যে হৃদয় চোখ মেলে গ্রহণ

করে” সেই হৃদয় দিয়ে আর তাঁর বিজ্ঞান ক্ষেত্রের একটা সামগ্রিক অবলোকনলব্ধ জ্ঞান দিয়ে। এই ধরনের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও সার্বজনিক জ্ঞানের মিলন, তথ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের মিলন, ধারণাশ্রিত জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংবেদের সংযোগ, শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিচারের সঙ্গে মার্জিত সাহিত্যিক বাক্-এর মিলন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্ভব—তা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, অনুভবের ক্ষেত্রেই হোক বা চিন্তার ক্ষেত্রেই হোক।

মানুষই মানুষের উপযুক্ত অনুশীলনের বিষয় কিংবা মানুষের অনুশীলনযোগ্য যত বিষয় আছে তার মধ্যে যোগ্যতম বিষয় মানুষ নিজেই। কবিরা, নাট্যকারেরা, কাহিনীকারেরা বা দার্শনিক নিবন্ধ রচয়িতারা এই অনুশীলনে কতদূর যোগান দিয়েছেন? অতীতে এবং বর্তমানেই বা কতটা জোগান দিচ্ছেন? মানুষের অনুশীলন প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমাহৃত হয়েছে সেই সম্পদের প্রতি এই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকলাসাধকদেরই বা কী মনোভাব হওয়া উচিত? তাঁরা কীভাবে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারেন? কোন্ পথেই বা এই জ্ঞানকে প্রসারিত করতে পারেন এবং কী ভাবেই বা এই জ্ঞানকে তাঁদের সৃষ্টির অঙ্গীভূত করতে পারেন?

আটাশ

'মানুষ' এই কথাটা বর্তমান কালে ন্যূনপক্ষে তিনটে অর্থে প্রযুক্ত হয়। একটা অর্থ সমস্ত মানবজাতি অর্থাৎ এই গ্রহে বসবাসকারী মনুষ্য নামক জাতি। এই কথার দ্বিতীয় অর্থ ইতিহাসের কোনো বিশেষ কালে নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতিমণ্ডলের বাসিন্দা মানুষ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট গড় ধারণা। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা বলে থাকি "আদিম মানুষ" "প্রাক্ আধুনিক যুগের সভ্য (Classical) মানুষ, পাশ্চাত্যের মানুষ, ঐতিহাসিক কালের মানুষ, ইত্যাদি। হোমো সাপিয়েন্স (Homo sapiens) বা জ্ঞানবান মানুষের প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সংখ্যায় কুকুরের বিভিন্ন উপজাতির মতোই সংখ্যায় বহুল, আর এই গোষ্ঠীরা কুকুরের বিভিন্ন উপজাতির মতোই পরস্পর থেকে বিভিন্ন। সবশেষে 'মানুষ' বলতে বোঝায় অনন্য, ব্যক্তি মানুষ, --বর্তমানের তিনশো কোটি বিভিন্ন মানবীয় অস্থিতন্ত্র (anatomy) আর শারীর তন্ত্র—ব্যক্তিগত অপ্রতিবেদ্য সংবেদের তিনশো কোটি জীবিত চরবিন্দু।

দার্শনিক ও সাহিত্যকলাকারদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বিদ্বান তাঁরা সেদিন পর্যন্ত মানুষরূপ প্রাণীপ্রজাতির সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আর যে মানুষ সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট প্রাণী, তার সম্বন্ধেও তাঁরা খুব অল্প জানতেন। এই সেদিন পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠের বেশীর ভাগ আবিষ্কৃত হয়নি, পুরাতত্ত্ব বলে কোনো বিজ্ঞান শাখার পত্তন হয়নি, আর যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁরা স্থানীয় ঘটনার কড়চা লেখক মাত্র ছিলেন। অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটা মাত্র ভিন্ন দেশীয় কৃষ্টি ছাড়া এই ঐতিহাসিকরা বাকী কৃষ্টিমণ্ডল সম্পর্কে প্রায়

সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। আমরা যে অভিব্যক্তির পরিণাম, আমরা যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভুত্বশালী, সবচেয়ে বহুপ্রজ ও সবচেয়ে সংহারক প্রজাতি, আমরা যে একাধারে "কৃষ্টির" স্রষ্টা; ভোক্তা ও তার শীকার, আমরা যে ভাষারূপ সম্পদের প্রতিভাবান আবিষ্কর্তা, আবার অপর পক্ষে সেই ভাষারই মোহে মূঢ, এই আত্মজ্ঞান আমরা পেয়েছি মাত্র তিনটে চারটে প্রজন্ম পূর্বে, পেয়েছি পুরাতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিজ্ঞানবিদ, ক্রমবদ্ধইতিহাস রচয়িতা এবং সকল শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে।

যে মানুষ প্রাণিজগতের অন্তর্ভুক্ত, যে মানুষ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত শরীর সংস্থান, জৈব রসায়ন ও স্বভাবলক্ষণ যুক্ত প্রাণী বিশেষ, সেই মানুষ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা জেনেছি তার বেশীর ভাগ এসেছে জননবিজ্ঞানী, স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং জৈবরসায়নবিদদের কাছ থেকে এবং তারও বেশীর ভাগ এসেছে আমাদের এই চলতি শতাব্দীতে। এই নবলব্ধ জ্ঞান—বিশেষ ক'রে নূতন সামাজিক জ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের নূতন জ্ঞান আর ঐতিহাসিক জ্ঞান দিয়ে যে একটা বিশেষ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সেই বাতাবরণের সীমার মধ্যেই সাহিত্যিক, তাঁর সমকালীন প্রায় অন্যান্য সকলের মতেই, তাঁর বিষয়জ্ঞান, আবেগ চিন্তা ও আত্মপ্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এর বাইরে যে জ্ঞান তা এখনো সাহিত্যের বেষ্টনীর বাইরে। মানুষকে অনন্য ব্যক্তিরূপে, কৃষ্টির উত্তরফলরূপে এবং প্রাণীপ্রজাতিরূপে বিচার করা আর এই বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ আর্ণল্ডের কথায় "জীবনপর্যালোচনা"কে (Criticism of life) সাহিত্যকলার পরিমার্জিত ভাষায় অবয়ব দেওয়া যাঁদের চিরাচরিত কর্ম তাঁদের মননের সঙ্গে এই অবশিষ্ট জ্ঞান এখনো স্বাঙ্গীকৃত হয়নি।

ঊনত্রিশ

কে আমরা? কী আমাদের পরিণতি? ভগবানের ভীষণ লীলার কীইবা উদ্দেশ্য? বিজ্ঞানের উদ্ভবের পূর্বে এই সব প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছেন একমাত্র দার্শনিক কবিরা ও কবিদার্শনিকেরা। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতবর্ষে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিণতির কূট রহস্যকে ভেদ করা হয়েছে একটা বিশেষ তত্ত্ব দিয়ে। এ তত্ত্ব অবিশ্বাস্য রকম সরল এবং আচারনির্ভর। এ তত্ত্ব কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ। বর্তমান জীবনের সৌভাগ্য পূর্বজন্মের পুণ্যের ফল। এই জন্মে যদি যন্ত্রণা পাও তাহলে জানবে এ তোমার নিজের ত্রুটি, তুমি পাপ করেছো পূর্বজন্মে। মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, মানুষের অস্তিত্বের চরমার্থ জন্মমৃত্যুর এই সদাঘূর্ণিত চক্র থেকে মুক্তি। নিজের কর্মফলসৃষ্ট স্বর্গ আর একেবারে নিজেরহাতেগড়া নরক, এই দুইয়ের অনন্ত-কালব্যাপী চক্রাবর্ত থেকে মুক্তি।

খৃষ্টীয়মতবাদী প্রতীচ্যে এই কূট রহস্যের সমাধান করা হয়েছে (সমাধান না বলে বরং নূতন ভাবে বর্ণন বলাই উচিত) অন্যভাবে। বিশেষ কোন জ্ঞানের অগোচর, অলৌকিক, নিয়তি-নির্দিষ্ট ঘটনা দিয়ে এর সমাধান করা হয়েছে। এই ঘটনার পক্ষে কোনো যুক্তিসম্মত (কেননা জন্মান্তরবাদ এখানে অবান্তর), এমনকি আচার সমর্থিত কোনো কারণও দেওয়া হয় নি। ব্যাপারটা সর্বশক্তিমানের স্বৈরতা অর্থাৎ ঈশ্বরের খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্য কারণের মধ্যে, বিশেষ করে, মানুষে মানুষে যে পরিলক্ষণীয় পার্থক্য তার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের ভাগ্যের সূত্র। এই পার্থক্য কি বংশধারাক্রমপ্রাপ্ত, অথবা ব্যক্তিদ্বারা অর্জিত কিংবা একই সঙ্গে

বংশধারাপ্রাপ্ত এবং অর্জিত উভয়ই? প্রকৃতি আর পোষণ এই দুয়ের মধ্যে কার কতটা প্রভাব এই প্রশ্নটার মীমাংসায় ঈশ্বরত্ব ও পরাবিজ্ঞানের সূত্রের ব্যবহার বহুশতাব্দী ধরেই সমীচীন বলে গৃহীত হয়ে এসেছে। অগাষ্টাস-এর মতাবলম্বীরা (Augustinians) লড়াই করেছেন Pelagas-এর মতাবলম্বীদের সঙ্গে। হেলভেটিয়াসের Helvetius মতো অর্বাচীন আচরণবাদীরা (behaviourists) (অসম্ভব সম্ভবের বিচারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং কোনোপ্রকার প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই) জানসেন (Jansen) মতবাদী ক্রীশ্চানদের বিরুদ্ধতা করেছেন এই বলে যে সেভেন (Cevennes) প্রদেশের যে কোনো রাখাল বালককে যথাযথ শিক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় নিউটন (Newton) কিংবা (শিক্ষকের মর্জি হলে) দ্বিতীয় St. Francis of Assisi তে পরিণত করা সম্ভব। রুশো (Rousseau) লিখেছেন, 'স্রষ্টার আপন হাত থেকে সরাসরি যা আসে তাই অবিকৃত আর মানুষের হস্তাবলেপে সবকিছুই বিকৃত।' আজকের দিনে এই 'স্রষ্টা' ফ্যাশানে অচল, তবু বহু সমাজবিজ্ঞানী আর সাহিত্যিক তাঁদের অনুভব আর চিন্তার বিচরণকে বাতাবরণরূপ নিয়তির কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। এঁরা একদেশদর্শী হলেও ক্ষমার্হ। মানুষে মানুষে মৌলিক পার্থক্যের বিচার সাহিত্যকলার মতো প্রাচীন হলেও জননবিজ্ঞান সবেমাত্র, আমাদের জীবনকালের মধ্যেই, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোনো যুগে বা যে কোনো দেশে যে কোনো নাট্যকার বা কাহিনীকারের পক্ষে সুস্থচিত্তে Falstaff ফলস্টাফ্-এর মতো চরিত্রকে Hotspur হটস্পারের মতো কায়াদান করা বা Pickwick পিকউইককে Uriah Heap উরিয়া হীপের মতো কায়াদান করা স্বপ্নেরও অগোচর।

মানুষের পরিণতি (এই পরিণতি যে পরিমাণে আমাদের মৌলিক মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করে) বিচারের যে বিজ্ঞান

তার সূত্রপাত হয়েছে গ্রীকরোমক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দেহরসতত্ত্বে। প্রত্যেক মানবদেহে চার রকমের দেহরস ক্ষরিত হয় আর এদিক থেকে সব দেহই এক। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তার কারণ এই যে বিভিন্ন দেহে এই চারটে রস বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত। এই রসচতুষ্টয়ের সাম্যাবস্থা নষ্ট হলেই রোগের আবির্ভাব ঘটে। জন্ম থেকেই প্রত্যেক মানুষ একটা বিশিষ্ট মানসিক গঠনের অধিকারী অর্থাৎ এই রসচতুষ্টয়ের এক বিশেষ আনুপাতিক মিশ্রণের অধিকারী। যখন এই মিশ্রণের প্রকৃতি বদলায় তখন মানুষের ডিস্‌টেমপার (Distemper) বা স্বভাবের বিপর্যয় ঘটে। (এই ডিস্‌টেমপার কথাটা অদ্যাবধি চলে আসছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজারও ডিস্‌টেমপার হতে পারতো। আজকের দিনে, কোনো এক উদ্ভট ঐতিহাসিক কারণে, ডিস্‌টেমপার বলতে কুকুর বা বিড়ালের একটা বিশেষ রোগ বোঝায়)।

Benjonson বেনজনসন-এর নাটকীয় চরিত্রেব শ্রেণীবিভাগ তাঁর যুগের সবচেয়ে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেব ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব তত্ত্ব খুবই স্থূল। তাই ফলষ্টাফ ও ক্লিওপেট্রার স্রষ্টা বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যে জনসনের চেয়েও ন্যূন হলেও তাঁর সৃষ্টির তুলনায় বেনের চরিত্রগুলি অকৃত্রিমতায় ও রক্তমাংসের সজীবতায় অনেক ন্যূন।

অবশেষে মাত্র বিংশশতাব্দীতে পৌঁছে বিজ্ঞান সাহিত্যের নাগাল পেয়েছে এবং একদিকে মানুষের শারীরসংস্থান আর অপরদিকে তার প্রকৃতি ও আচরণ এই দুপক্ষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে। এতকাল সাহিত্যিকরা তাঁদের স্বভাবজ-জ্ঞানবলে যা করেছেন আজ তাই করছেন বৈজ্ঞানিক অনুশীলকরা এবং সংখ্যাবিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রণালীবদ্ধ বিচারে। শারীরসংস্থানের ভিত্তিতে বংশগতনিয়তির অনুশীলন করেছেন

Kretschmer (ক্রেচমার), Stockard (ষ্টকার্ড) ও William Sheldon (উইলিয়াম শেলডন); জৈবরাসায়নিক স্তরে এর অনুশীলন করেছেন Roger Williams (রোজার উইলিয়াম্‌স্‌) আর পাগলদের ক্ষেত্রে এই বংশগতনিয়তির প্রভাব বিচার করেছেন Hoffer (হফার), Osmond (অসমণ্ড), Heath (হীথ), Altdorf (আল্‌টডর্ফ) এবং রুশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার বহু বৈজ্ঞানিক। এটা এখন পরিষ্কার ভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে যে ব্যক্তিত্বেরবিশ্লেষরূপ রোগ (Schizophrenia) এবং অন্যান্য দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিব প্রবণতা মানুষের সহজাত। আর, যেসব আচরণকে আমরা অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করি সেই সব আচরণের প্রবণতাও সহজাত। 'অপরাধ মানুষেব নিয়তি' (crime is destiny) এই নামের এক পুস্তকে (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে J. B. S. Haldane (জে বি এস হ্যালডেন)-এর ভূমিকা সহ ইংরেজীভাষায় প্রকাশিত) যোহানেস লাঙ্গে (Johannes Lange) একই রকমের দেহ এবং একই মাত্রায় অপরাধপ্রবণ কয়েকজোড়া যমজদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এব ফলাফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর বিশ বছর পরে শেলডন ও গ্লক্‌স্‌ (Sheldon ও Gluecks) তাঁদের গবেষণা দিয়ে অপরাধমূলক আচরণ এবং বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত শারীরগঠন ও প্রকৃতির মধ্যে সহসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'মানুষ তৈরী সহবতে' বলা হয় বটে, কিন্তু তাই বলে ইংরেজী প্রবাদের ভাষায় 'শূকরীর কান দিয়ে রেশমের বটুয়া তৈরী হয় না!' এই দুটোই প্রাচীন প্রবাদ এবং দুটোই অংশতঃ সত্য। মানুষের আদি পরিণতি তার হেরিডিটি বা অনুবংশিকতার বাধ্য এবং তার অন্তপরিণতি বাধ্য তার পরিবেশের। ঈষৎ মন্দ আদি-ভাগ্যের হানিটুকু গড়-চেয়ে-ঈষৎ-ভালো পরিবেশের উত্তরভাগ্যের প্রভাবে পূরণ হতে পারে বটে, কিন্তু সর্বোত্তম উত্তর-ভাগ্য যে

অতিমন্দ পূর্বনিয়তির পরিণামকে সম্পূর্ণ ঠেকাতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত কুত্রাপি কখনো মেলে নি।

এবার ব্যষ্টির কর্মফল আলোচনা রেখে সমষ্টিভাগ্যের প্রহেলিকার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। কিপ্‌লিং (Kipling) বলেছিলেন যে এখনও এমন নিম্নকোটির জাতি আছে যাদের মধ্যে আইনানুবর্তিতার কোনো বালাই নাই। কথাটা সম্ভবতঃ মিথ্যা। তবু অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মতো একথা হয়তো তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বভাবের যে পার্থক্য প্রকট তা শুধুমাত্র কৃষ্টিগত নয়, তা নিশ্চয়ই, অন্ততঃ অংশতঃ, বংশগত কারণের ওপর নির্ভরশীল। ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ ও মনস্তাত্ত্বিক লিয়ঁ বুরদেল (Leon Bourdel) বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তার ফলে এই সহজজ্ঞানের অনুমান কিছুটা বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করেছে।

কোন বিশেষ মনুষ্য গোষ্ঠীতে এ, বি, ও, এবং এবি (A, B, O, AB) এই চার শ্রেণীর রক্তেব বিশেষ কোন একটির প্রাধান্য সেই গোষ্ঠীর সামাজিক পরিণতির অদৃষ্টনিয়ন্তা। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, যে সব জাতির মধ্যে 'বি' রক্তের জন সংখ্যা অনুপাতে বেশী তাদের মধ্যে যোদ্ধৃ মনোভাব স্বতঃস্ফূর্ত। অপর পক্ষে আবার যখন 'এ'-রা এবং 'বি'-রা যথেষ্ট সংখ্যায় পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন প্রায় নিমেষেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘাতটা এখানে দুটো বিরুদ্ধ জীবনপ্রণালীর মধ্যে, দুটো বিপরীত জৈবিক ছন্দের মধ্যে, দুটো পরাবিজ্ঞান বা মেটাফিজিকস-এর মধ্যে, দুটো বিভিন্ন শাসন প্রণালীর মধ্যে। 'এ' শ্রেণীর প্রকৃতি 'বি' শ্রেণীর প্রকৃতি থেকে যদি এমনই পৃথক হয় যে একটা কখনো অন্যে রূপান্তরিত হতে পারে না, তাহলে এই যুক্তি অনুসরণ করে বলা যায় যে 'এবি' শ্রেণীর মিশ্রিত ব্যক্তিরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণার

কবলে গিয়ে পড়ে। তা ছাড়া, যে সব সমাজে 'এবি' শ্রেণীর জনসংখ্যা বেশী তারা নিয়তির বশে দুরারোগ্য চিত্তবিক্ষেপ এবং চিরস্থায়ী-বিপ্লব-বিধ্বস্ত ইতিহাসের হাতে ক্রীড়নক।. (বলা হয়, বলকান উপদ্বীপ, নিকটপ্রাচ্য, মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ 'এবি' শ্রেণীর জাতিদ্বারা অধ্যুষিত)।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকের হাতে বিজ্ঞান নবআবিষ্কৃত বহু তথ্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে বহু অন্বীষাত্মক সিদ্ধান্ত (tentative hypothesis) যোগান দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-শিল্পী যদি এই দানকে গ্রহণ করেন এবং এই নূতন উপাদানকে সাহিত্যশিল্পে রূপান্তরিত করার মতো তাঁর যথেষ্ট প্রতিভা এবং নৈপুণ্য থাকে, তাহলে তিনি মানুষের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন বিষয়কে এখন গভীর বোধ দিয়ে ও এতো বিস্তৃত প্রসঙ্গের পটভূমিকায় চিত্রিত করতে পারবেন যে গভীর বোধ ও বিস্তৃতি তাঁর পূর্বসূরীদের আয়ত্তের বাইরে ছিল (যদিও এই অক্ষমতার কারণ তাঁদের প্রতিভার ন্যূনতা নয়)।

ত্রিশ

ঈশ্বরের লীলার মর্ম কোনোদিনই অনুধাবন করা যায় নি, তবু সেই লীলাকে অংশতঃ লৌকিক অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বের বাইরের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের অদৃষ্টে কেন এসব ঘটে? আমরা পূর্বেই দেখেছি, মানুষের ভাগ্যরূপ এই প্রহেলিকার উত্তর খণ্ডখণ্ডভাবে আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে। খণ্ডখণ্ড হলেও এসব উত্তর মোটামুটি কার্যকরী এবং আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়। এই ভাগ্যের-সঙ্গে-অঙ্গাঙ্গিভাবে-সংযুক্ত মানবপ্রকৃতির যে রহস্য তার সম্পর্কেও ঠিক একই কথা খাটে। আমরা কি ও কে? এই প্রশ্নের পুরো উত্তর এখনো মেলেনি। আমরা অনেক কিছু জেনেছি, কিন্তু আমরা এখনো জানিনে কী করে এই সব টুক্‌রো জ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে বের করে তাদের একটামাত্র ব্যাখ্যার সূত্রে বাঁধবো। আজকের দিনের একজন প্রতিভাশালী মনস্তাত্ত্বিক D. H. Eysenck, ডি, এইচ, আইজেন্‌কের ভাষায় বলতে হয়: 'আমাদের আয়ত্তে এমন কোনো সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্ব নাই যা দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কেমন করে বস্তু আর মন চেতনার সহজ একটা খণ্ড বিকাশে পরস্পরকে প্রভাবিত করে ; এখনো এমন কোনো বিধিবদ্ধ তত্ত্ব আমাদের হাতে আসে নি যা দিয়ে আমরা সম্মোহন বা পরচিত্তঅধিকার কিংবা স্মৃতির ব্যাখ্যা করতে পারি।'

যা আমাদের করায়ত্ত তা শুধু বিচ্ছিন্ন, পরস্পর-অসংলগ্ন একরাশি তথ্য। এই তথ্যসম্পদকে আমরা এখনো একটা ব্যাপক তত্ত্বে গ্রথিত করতে পারি নি, তবু এই তথ্যেরা তাদের নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান। এরা অনুমানের দিক্‌নির্দেশ করে এবং বিচারকে প্রবুদ্ধ

করে। এক কথায়, এরা সেই ধরনের উপাদান যা দিয়ে সাহিত্য নির্মিত হয়। আমরা কারা? আমরা কী করে এই পরিণতি লাভ করলাম? যুগে যুগে সাহিত্যিকরা এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টায় তাঁদের যুগের বৈজ্ঞানিক-ব'লে-চিহ্নিত তথ্য ও ধারণাকে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজেদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের গোড়ায় (যথা হোমারের যুগে) ফিরে গেলে দেখতে পাই যে মানুষেব আত্মাব কোনো একটা নির্দিষ্ট রূপ নাই। প্রেতলোকে তার আত্মা একটা ছায়ামাত্র। আর এই ছায়া পরলোকে ক্ষীণকণ্ঠে চিঁচিঁ রবে প্রলাপ বকে চলে। অপরপক্ষে ইহলোকে এই আত্মা একরাশি দেহমনলক্ষণের সমিতি মাত্র, যে সমিতির সভ্যবা অনিচ্ছায় সহযোগিতা কবে চলেছে। অর্থাৎ আত্মা যেন এমন একটা পার্লামেণ্ট বা পরিষদ যাব জ্ঞান বা বুদ্ধিরূপ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব কেবলই বানচাল হয়ে যাচ্ছে জান্তব প্রাণশক্তি, মোহ আর প্রবৃত্তিরূপ প্রতিপক্ষকুলের মুখপাত্রদের ভোটে। আর, জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে যে শুধু কাম ক্রোধ মোহের সঙ্গেই পাল্লা দিতে হচ্ছে তাই নয়, প্রতিপক্ষে আবার দেবতারাও আছেন। দৈবের হস্তক্ষেপ নিত্যঘটনা এবং প্রায়শঃ ক্রুব। জিউসের (Zeus) বহু আত্মজার মধ্যে একজন হলেন 'আতী' (Ate)। হোমারের কবিতায় এই নামের অর্থ 'দেহমনের সেই অবস্থা যা সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।'

যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য এবং মহানুভবতম সদিচ্ছাকে বিপর্যস্ত করে এই 'আতী' কৌতুক অনুভব করেন। আর এই 'আতী' যেই অরিষ্ট থেকে বিরত হলেন অমনি শুরু হোলো উচ্চতর পর্যায়ের দেবতাদের হানা। তার ফলে নিরীহ ভাগ্যহত মানুষ এমন যন্ত্রণার কবলে পড়ল যা সে নিজের কর্মফলে অর্জন করে নি, কিংবা নির্বোধের মতো

এমন একটা অপরাধে জড়িয়ে পড়ল যা ডেকে আনলে তার সর্বনাশকে।

দিব্যসত্তাদের হস্তক্ষেপ কিন্তু সব সময় ক্রূর ছিল না। মিউজ (Muse)-দের কারো না কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ঘটনাও ঘটতো। কোনো কোনো সময়ে কোনো দেবতা বা দৈবী সত্তা প্রিয়ভক্তের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তা ছাড়া 'মেনোস' (Menos) বলে চিহ্নিত এমন একটা অবস্থা ছিল যে অবস্থা মানুষকে সাফল্যে পৌঁছে দিতো। 'মেনোস' মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তার সহজাত সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়ে, তাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করিয়ে নিতো। হোমার কৃত মনুষ্যপ্রকৃতির এই বিশ্লেষণকে আমরা এখন অবিশ্বাসের স্মিতহাস্যে গ্রহণ করি। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে আমাদের পূর্বপুরুষরা তথ্যসম্পদে আমাদের চেয়ে দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা আমাদের তুলনায় বেশী মূঢ় ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি পরিচিত অথচ অদ্ভুত এবং বিভ্রান্তিকর মানসিক আধির কথাই ধরা যাক। এদের ব্যাখ্যায় আমরা কয়েকটা মোটামুটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যবহার করি। এই তত্ত্বগুলি হোলো: মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা, 'নিউরসিস' বা চিত্তবৈকল্যরূপ আধি, কামনার অবদমনজাত মৃগীরোগ, আপেক্ষিক স্নায়বিক প্রতিবর্তন (Conditioned reflex), অভ্যাস নির্মাণ তত্ত্ব, স্বাভাবিক অবগতিপ্রক্রিয়া (Learning process) এবং সবশেষে বংশধারাপ্রাপ্ত কিংবা স্বয়মার্জিত জৈবরসায়নের বিশৃঙ্খলা।

এই সব মানসিক রোগীদের মনে হয় যেন তাদের 'বাইরে থেকে' অপ্রতিরোধ্য শক্তিরা এসে তাদের আত্মাকে আক্রমণে বিধ্বস্ত করে ফেলে। এই 'বাইরে'টাও আমাদেরই অন্তর্লোকে। তাই আমাদের অনুভব, চিন্তা, বাচন ও কাজের মধ্যে কিছু কিছু যা বৈলক্ষণ্যে অদ্ভুত, তাদের সবচেয়ে সহজবোধ্য ও আপাত সঙ্গত যে

ব্যাখ্যা তা দৈবহস্তক্ষেপতত্ত্বের সূত্র ধরে। যে কালে শারীর ও মানসিক তথ্যের কোনো সুসংবদ্ধ সংচয়ন ছিল না, আর এই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে কোন কার্যকরী তত্ত্ব রচিত হয় নি, তখন এই অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্বের সাহায্যে মানুষের নিজের কাছে নিজের মুখ রক্ষার কোনো উপায় ছিল না। এই তত্ত্বই অলৌকিক সত্ত্বাদের দ্বারা পীড়িত এবং অভিভূত মানুষের প্রত্যক্ষ আচরণের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার জোগান দিয়েছে। তারপর এই মাত্র সেদিন, অর্থাৎ অতি আধুনিককালে মাত্র, দেহরসায়ন ও মনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার লৌকিক তত্ত্ব, স্বাভাবিক অবগতি তত্ত্ব, আপেক্ষিক স্নায়বিক প্রবর্তনার তত্ত্ব এবং জঙ্গম নির্জ্ঞানেব তত্ত্ব (dynamic unconscious) এই দৈবতত্ত্বেব স্থান অধিকার কবেছে।

প্রাচ্যে ভারতীয় দিগম্বর যোগিদের এবং, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, উত্তরে মধ্য এশিয়ার তৃণভূমির শামান (Shaman) বা সিদ্ধপুরুষদের সংস্পর্শের ফলে, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে হোমারীয় মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক উপাদান সমূহেব মিলিত বিতর্ক সভার পরিবর্তে এল আত্মার দ্বৈতবাদ। এল এমন এক আত্মার ধারণা যে আত্মা কবররূপ কিংবা আত্মসংশোধনের কারাগাররূপ এক দেহে বন্দী। দেহের জড় উপাদান আত্মা দিয়ে চালিত এবং আত্মা দিয়ে প্রাণবন্ত। মৃন্ময় ও পচনশীল দেহের মধ্যে বন্দী একটা বিচ্ছিন্ন আত্মার ধারণা থেকে আদিপাপের ধারণার উৎপত্তি এবং তার সঙ্গে অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার ধারণাবও উৎপত্তি। দেহকে ক্লিষ্ট করার পথ ছাড়া এই আধ্যাত্মিকতা অর্জনের অন্য কোনো পন্থা নাই। অরফীয় (orphic) গুহ্যসাধন তত্ত্ব এবং পিথাগোরাস (Pythagoras) পন্থীরা প্লেটোর (Plato) আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলেছিল। প্লেটোদ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, ইরাণীয় দ্বৈতবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনুষ্যপ্রকৃতির এই নূতন তত্ত্ব ক্রীশ্চান ধর্মীয় প্লাবনের মুখে আমাদের

কৃষ্টির ইতিহাসে প্রবেশ করেছে। মধ্যযুগীয় ঈশ্বরতত্ত্ব এই মানবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আরিস্ততেলীয় (Aristotelian) বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে একে পুষ্ট করেছে। উদ্ভিদধর্মিতা, পাশবিকতা ও যুক্তিমত্তা এই ত্রয়ী একত্রে আত্মাকে নির্মাণ করেছে। এরাই আত্মার উপাদান আর এই একত্রীভূত ত্রিনীতি (Trinity) দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ দেহময় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই দেহ আবার ধর্মচতুষ্টয়ে বিধৃত। এই ধর্মচতুষ্টয় উষ্ণতা, শৈত্য, সরসতা এবং শুষ্কতা কিংবা রক্তাধিক্যতা, শ্লেষ্মাধিক্যতা, ক্রোধ-আধিক্যতা ও বিষাদ-আধিক্যতা। এই চতুষ্টয়আশ্রিত মধ্যযুগীয় ত্রয়ী বা ত্রিনীতি আগের কালের বহুপক্ষ সম্বলিত, পরিষদরূপে কল্পিত আত্মার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আধিদৈবিক হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। হোমারের কুসংস্কারের সঙ্গে ইহুদীরা এবং খ্রীষ্টানরা তাঁদের বীভৎস কল্পনা জুড়ে দিয়েছেন। এই কল্পনায় মানুষের চিত্তের ওপর অসংখ্য দানব সবসময় তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, পৈশাচিক ভাবের উপদ্রব লেগেই আছে, আর মাঝে মাঝে সন্ধি স্থাপিত হচ্ছে দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে, যার একপক্ষ যেন ওঝার কাজ করছে আর অপর পক্ষে আছে পাকাপোক্ত বাস্তবনরকের ভূত-প্রেত। সবচেয়ে বিশ্বস্ত ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের মতে উপরিউক্ত সন্ধির ফলে মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ অনন্তকালস্থায়ী যন্ত্রণার কবলে পতিত, এবং এইই তাদের নিয়তি।

মনুষ্যপ্রকৃতির এইসব তত্ত্ব আজকের দিনে উদ্ভট মনে হলেও, এরা একদিন নিঃসন্দেহে মানুষের কাজে লেগেছে। প্রচলিত নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানকে ব্যবহার করেই আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু যে জীবনধারণ সমস্যার সমাধানই করেছিলেন তা নয়, তাঁরা প্রয়োগবিদ্যারও উন্নতিসাধন করেছিলেন, বিকাশক্ষম সমাজ রচনাও করেছিলেন এবং অপূর্ব শিল্পকলাও সৃষ্টি করেছিলেন।

একথা অবশ্য সত্য যে তাঁরা আকছার এই সব তত্ত্বকে স্থির সত্য বলে জ্ঞান করতেন, কবিকল্পনাকে পরীক্ষিত সত্য বলে গ্রহণ করতেন, চিত্রকল্প উপমাকে প্রত্যক্ষ বাস্তব বলে মেনে নিতেন এবং দার্শনিক কথকদের বাগাড়ম্বরকে ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করতেন। অবশ্য যখনই এই ব্যাপার ঘটেছে তখনই ঘটেছে ঘোর অনর্থ। এই অসার নৃতত্ত্ব এবং অলীক জীবনদর্শনের অনুশাসনকে পালন করে তাঁরা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উন্মত্ততায় অবতীর্ণ হয়েছেন, বীভৎস আত্মপীড়নে ও তথাকথিত বিধর্মী-পীড়নে ব্যাপৃত হয়েছেন, প্রবৃত্তিলালিত জীবনকে অস্বীকার করেছেন এবং ডাকিনী অপবাদ দিয়ে ভাগ্যহতা বহু স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করে ক্রুরসম্ভোগের (sadism) তৃপ্তি অনুভব করেছেন, নিষ্ঠুর নৈষ্ঠিকতায় ও জেহাদে (ক্রুশেড-এ) মেতেছেন, এমনকি বর্বর বীভৎস ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যে সব ধারণাকে আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিই আর যে সব ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষদের উন্মত্তের মতো বুদ্ধিভ্রংশতায় প্ররোচিত করেছিল এই দুই শ্রেণীর ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু যদিও কারণে কারণে পার্থক্য আছে তবু এই বিভিন্ন কারণের ফল ফলেছে একই ধরনের। অন্ততঃ সমষ্টিগতভাবে। মনুষ্যপ্রকৃতি আর জাগতিকপ্রকৃতি সম্পর্কে অলীক ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনিবার্যরূপে পীড়ন, অত্যাচার ও হত্যায় প্ররোচিত করেছে এবং তা সব সময় ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে। আমরাও হত্যা করি, অত্যাচার করি, পীড়ন করি। কিন্তু আমরা এই সব দুষ্কার্য দিয়ে আল্লাহ্ কিংবা ত্রিনীতিকে (Trinity) পরিতুষ্ট করতে চাই না। আজকের দিনে আমাদের সমষ্টিগত মতিবিপর্যয় (paronoia) দানা বাঁধে জাতীয়তাবাদরূপ পৌত্তলিকতাকে ঘিরে কিংবা দলের প্রতি আনুগত্যকে কেন্দ্র ক'রে। এই অপব্যবহৃত ধারণাগুলো, মাত্রাতিরিক্ত-মূল্য-দেওয়া এই সব

কথাগুলো নতুন বটে, কিন্তু এদের ফলশ্রুতিরূপ যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়ন তা ভয়ঙ্করতায় অতি পুরাতন। একথা বলাই বাহুল্য যে বিজ্ঞান কোনোদিন হত্যাকাণ্ড আর উৎপীড়নের সমর্থনে কোনো যুক্তিই সরবরাহ করে না। বিজ্ঞান উন্নত প্রয়োগবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হয়ে অতিপুরাতন উন্মত্ততা প্রকাশের অভিনব ও অধিকতর কার্যকরী উপায় সরবরাহ করে মাত্র। যে সব উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয় সেই সব উদ্দেশ্য কিন্তু নির্দ্ধারিত হয় অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবে। অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যা সব ধারণা, মানবীয় সত্তার সামর্থ্য সম্পর্কে যা ধারণা, আর মনুষ্যরূপ প্রাণী প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত অনন্যব্যক্তিরূপ যে মানুষ তার বেঁচে থাকা আর 'মানুষ' হওয়ার জীবতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের যা সব ধারণা তাদের দিয়েই বিজ্ঞানের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়।

একত্রিশ

হোমার কথিত দৈহিক আর মানসিক উপাদানের একটা সদাবিবদমান সত্তার মতো আত্মার ধারণা আশ্রয় করে যে প্রাথমিক অদ্বৈতবাদ উদ্ভূত হয়েছে তাকে অনুসরণ করে আমরা পৌঁছাই সিদীয় (Scythian) শামান বা সিদ্ধপুরুষদের ধারণায়। এঁরা নিজেদের অলৌকিক আধারে পরিণত করে তথাকথিত 'স্থানকালে চরমান দিব্যদৃষ্টি' (travelling clairvoyance) লাভের সাধনাকে আয়ত্ত করেছিলেন। তারপর এই সিদ্ধ পুরুষদের পর্যায় থেকে পৌঁছাই অরফীয় (orphic), পিথাগোরীয় বা প্লেটোনীয় মানবতত্ত্বে। এই তত্ত্বানুসারে মানুষের আত্মা একটা বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তা, আর দেহ এই আত্মার যুগপৎ কারাগার ও কবর। এই সব মানবতত্ত্ব পেরিয়ে আমরা উপনীত হয়েছি খ্রীষ্টীয় মানবতত্ত্বে। এই খ্রীষ্টীয় মানবতত্ত্ব ঝুলছে দুটো সীমার মধ্যে। একটা সীমায় 'মণি'-পন্থীদের (Manichaens) দ্বৈতবাদের মতো প্রায় নির্ভেজাল দ্বৈতবাদ, আর এক সীমায় একধরনের উদ্‌বৃত্ত অদ্বৈতবাদ (rcsidual monism)। এই বিচিত্র অদ্বৈতবাদ রূপ নিয়েছে দেহপুনরুত্থানবাদের মতো একটা দুর্বোধ্য পারলৌকিকতত্ত্বে। দেকার্তে-তে (Decartes) এসে আমরা সম্পূর্ণ অবিকৃত দ্বৈতবাদে পৌঁছেচি। এই কার্তেজীয় মতবাদ দুই শতাব্দী ধরে একটা ভিত্তিমূলক তত্ত্ব হয়ে আছে। সকল বৈজ্ঞানিক এবং কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ সাহিত্য শিল্পী মানুষরূপ প্রাণী সম্বন্ধে যা চিন্তা করেছেন তা এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই। এবং তাঁরা এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই মানুষরূপ প্রাণীর সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। ঊনবিংশশতাব্দীতে মনস্তত্ত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান

রূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা বিশিষ্ট শাখারূপে আধিবিজ্ঞানের (Psychiatry) উদ্ভব হয়েছে। সম্মোহন বা পরচিত্তপ্রসভ° (hypnosis) সম্পর্কে অনুশীলন করে এই মূল্যবান তথ্যটি জানা গেছে যে, যে সব অদ্ভুত মানসিক প্রকাশকে একদা বহিরাগত অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপের ফল বলে পরিগণিত করা হোতো তাদিকে যদৃচ্ছা সৃষ্টি করা যায় অভিভূত চিত্তে ইঙ্গিত নিহিত করে (Suggestion) এবং আরও জানা গেছে যে এই সব প্রকাশকে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া কলাপ দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

অষ্টাদশশতাব্দীব অষ্টমদশকের যে তারিখে F. W. H. Myers (এফ্, ডব্লিউ, এইচ মায়ার্স্) নিবন্ধ আকারে মানুষের 'প্রচ্ছন্ন মনের' (Subliminal self) তত্ত্বকে বিবৃত করেন (এই নিবন্ধ মায়ার্সেব মৃত্যুর পব প্রকাশিত তাঁর Human personality, 'মানুষের ব্যক্তিত্ব' নামের রচনায় বিস্তাবিত রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) সেই তারিখকে উইলিয়ম জেমস্ (William James) যথার্থ আধুনিক মনস্তত্ত্বের জন্মলগ্নরূপে চিহ্নিত করেছেন। অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েড (Freud) তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি আদিকাম (libido), অবদমন (repression) ও জঙ্গম নির্জ্ঞানের ধারণা দিয়ে মানুষেব আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েডের তত্ত্ব মায়ার্স্-এর তত্ত্বেব তুলনায় সঙ্কীর্ণতর। সমকালীন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের তুলনায় তিনি নির্জ্ঞানের যে দিকটাকে গঠনমূলক বলা যেতে পারে সেই দিকটার প্রতি অনেক কম মনোযোগ দিয়েছেন। মায়ারস্-এর কাছে 'আতী'র (Ate) চেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিল 'মেনোস'-এর (menos)। মনের যে বিশেষ অবস্থা বিপর্যয় ডেকে আনে সেই দিকটার প্রতি ফ্রয়েডের মূল লক্ষ্য ছিল। মানুষের যে

মানস অবস্থা তাকে সাফল্যে উত্তীর্ণ করে দেয় সেদিকে তাঁর নজর ছিল না। চিকিৎসক গবেষকরূপে ফ্রয়েড বেশ বড় একটা মৃগী ও স্নায়ু-বৈকল্যের রোগীগোষ্ঠী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন বলে 'আতী'র বিনাশাত্মক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। অপর পক্ষে যে সব মানুষের মধ্যে তিনি 'মেনোস'-এর অভিপ্লব, মিউজ বা কলালক্ষ্মীদের আবির্ভাব, দিব্যোন্মাদের প্রকাশ (enthusiasm) (en-theos = অভ্যন্তর + ঈশ্বর), বা যে জীবন-দেবতারূপ (daimon) শক্তি সক্রেটিস্‌কে সাবধান করেছিলেন সেই জীবন-দেবতাব কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করতে পারতেন, সে রকম অতি অল্প মানুষই তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতায় এসেছিল।

ফ্রয়েডের একদেশদর্শী নির্জ্ঞানবিচার সি জি য়ুং (C. G. Jung) দ্বারা সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধন সাধিত করতে গিয়ে য়ুংও বাড়াবাড়ি করেছেন। য়ুং 'মেনোস'-এর কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু মনে হয় তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'মেনোস' শুধু একরাশ প্রতীকের একটা বিশাল সাজসরঞ্জামেব সহায়তায়ই তার শুভ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। পুরুষানুক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ফলে আমরা সবাই একরাশি পুরাপ্রতিমা (archetype) নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। য়ুং-এর দৃষ্টিতে নির্জ্ঞান পৌরাণিক চরিত্রদের একটা জনবহুল অমরাবতী। অপর পক্ষে ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে নির্জ্ঞান যেন মাটির নীচে তৈরী একটা সাধারণ প্রস্রাবাগার আর এই প্রস্রাবাগারের দেওয়ালে দেওয়ালে অপটু হাতের লিপিতে ইংরেজীর চতুরক্ষর অর্থাৎ বাংলার দ্ব্যক্ষর অশ্লীল শব্দ উৎকীর্ণ। ফ্রয়েড শুধু যৌনপ্রতীকই খুঁজেছেন, তাই অন্য প্রতীকদের স্থান নাই তাঁর তত্ত্বে। এটা একটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে ফ্রয়েডপন্থী চিকিৎসকদের রোগীরা নিয়মিত ফ্রয়েডীয় প্রতীকেই স্বপ্ন দেখে,

আর য়ুংপন্থী চিকিৎসকদের রোগীরা স্বপ্নে সব সময় পুরাপ্রতিমার সাক্ষাৎ পায়। স্নায়ুবৈকল্যের রোগী যখন প্রকাশ্য বা পরোক্ষ ইঙ্গিতের পব ইঙ্গিতের আঘাতে হার মেনে তার চিকিৎসকের মনুষ্য-চেতনার ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয়, তখন ধবে নেওয়া হয় যে তার রোগমুক্তি হয়েছে অর্থাৎ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লাভ ঘটেছে।

বত্রিশ

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নানাদিক থেকে প্রতিবাদযোগ্য। এই তত্ত্বে এমন সব শব্দের ব্যবহার হয় যারা আপাতঃদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক হলেও যথার্থ বৈজ্ঞানিক নয়, কেননা তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা দিয়ে সিদ্ধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ অনুমান করা হয়েছে যে সন্তানের নির্জ্ঞানমন পিতার ভাবমূর্তির 'আভ্যন্তরীকরণের' ফলে (introspection) পরাঅস্মিতার (Superego) উদ্ভব হয়। কিন্তু এই 'আভ্যন্তরী-করণের' কোনো পরীক্ষাসিদ্ধ সংজ্ঞা নাই। তাই এই সংজ্ঞা শূন্যগর্ভ। এবার আমরা মনোবিকলনপদ্ধতি দিয়ে স্বপ্নবিশ্লেষণের বিচার করব। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব যে অভ্রান্ত তার প্রমাণঃ মনের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি (Censorship) এবং কল্পনায় কামনা চরিতার্থ করার (Wish fulfilment) প্রবণতা দিয়ে স্বপ্নের যে বিচার করা হয় তা ফ্রয়েডের মনুষ্যপ্রকৃতিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য, অপরপক্ষে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব যে অকাট্য তার প্রমাণঃ এই তত্ত্ব ফ্রয়েডের স্বপ্নবিচার পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথ সিদ্ধান্ত (Q. E. D.)।

এইসব তাত্ত্বিক ত্রুটি ছাড়াও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আরও ত্রুটি আছে। এক ত্রুটি, এ তত্ত্ব একান্ত একপেশে। আর এক ত্রুটি, মীমাংসাধীন প্রশ্নটাকে অত্যন্ত সরল করে ফেলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্যকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে এবং একেবারে পাইকারী ভাবে বর্জন করা হয়েছে। নির্জ্ঞানমানসক্রিয়ার কল্পনা (hypothesis) সিদ্ধ এবং কার্যক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। একে বাদ দিলে অলৌকিক হস্তক্ষেপের অর্বাচীন ধারণাকে মানা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই তত্ত্ব দিয়ে আমরা কোনো কোনো প্রকারের স্বাভাবিক মানবিক আচরণ অংশতঃ

ব্যাখ্যা করতে পারি, এবং এর সাহায্যে মৃদুধরনের মানসিকব্যাধির নিদানগুলির নিরাময়ও করতে পারি।

কিন্তু যত•তথ্য আমাদের গোচরে এসেছে তাদের সকলের যথার্থ বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা দিতে গেলে এবং রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি নির্ণয় করার উপযুক্ত তত্ত্ব পেতে গেলে এই যে তত্ত্ব মানুষের প্রকৃতিকে সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসিক ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল থেকে উদ্ভূত বলে উপস্থাপিত করে এই নিছক মনস্তত্ত্বাশ্রয়ী তত্ত্ব ছাড়াও অন্য তত্ত্বের প্রয়োজন। এই সব অন্য তত্ত্বেরা উপরিউক্ত পর্যায় থেকে ভিন্ন পর্যায়ের তথ্যের উপর নির্ভর করবে। পুরুষই হোক নারীই হোক, মানুষ মাত্রই পরিবেশস্পর্শজনিত সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসপ্রক্রিয়ার চরবিন্দু (locus) ছাড়াও আরও অনেক বেশী কিছু! এ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষ (বংশধারাক্রমেপ্রাপ্ত একটি অনন্য শারীরতন্ত্রের মধ্যে) জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াবলীর বংশক্রমপ্রাপ্ত একটা অনন্য আদল। দেহের আদল আর কোষবস্তুর গতিপ্রকৃতির আদল, কোনো না কোনো উপায়ে, ব্যক্তির মানসক্রিয়ার আদলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। এরা পরস্পরের সঙ্গে ঠিক কেমনভাবে সম্পর্কিত তা আমরা সঠিকভাবে জানি না, কারণ দেহের ওপর মনের ও মনের ওপর দেহের প্রভাব ব্যাখ্যার উপযোগী কোনো সন্তোষজনক তত্ত্ব এখনো পাই নি। কিন্তু এদের পারস্পরিক প্রভাব সবসময় আমাদের চোখে সুস্পষ্ট, আর যেসব ক্ষেত্রে শরীরগত ঘটনা মনোগত ঘটনাকে প্রভাবিত করে ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই সব ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

ফ্রয়েডের তত্ত্বের মূলে 'পরিবেশই নিয়তি' এই বাদ। এই তত্ত্বে বংশক্রমতাবাদকে (heredity) অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব একধরনের প্রায়নগ্ন মনস্তত্ত্ববাদ, এবং এই তত্ত্বে মানস-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত শারীর ব্যাপারগুলিও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই

উপেক্ষিত হয়েছে। ফ্রয়েডের সংগৃহীত নিদান বিবরণগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। রোগিনীর শরীরের ঝোঁক কোন্ দিকে? পৃথুলতার দিকে না তন্বীতার দিকে? কিংবা, রোগী স্বভাবউদ্যমী মধ্যমদেহী, না অতিরিক্ত স্পর্শকাতর অন্তর্মুখী ক্ষীণদেহী? এরকম তথ্য তিনি জানান নি আমাদের। তবু হোমারের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রত্যেক সাহিত্যকর্মী একথা জানতেন ও জানেন যে এই ধরনের প্রশ্ন তুলে সমস্ত বিবেকবুদ্ধি দিয়ে এর উত্তর না দিলে মানুষের বিচার কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রত্যেক মনস্তাত্ত্বিক, তা তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসবণ করুন বা স্বভাবজ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করুন, প্রযোগ বা তত্ত্ব যাইই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হোক না কেন, অন্তর্লোকের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জানতেই হবে, তাঁকে জানতেই হবে বিশেষ ধরনের মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে দেহের আকার প্রকারের যোগাযোগটা কেমন। কিন্তু গোঁড়া ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রে মানুষের গোটাদেহটা প্রায় কখনই আলোচ্য বস্তু বলে গ্রাহ্য হয়নি। মুখবিবর আর পায়ুব প্রতি অবশ্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই দুই ছিদ্রের মাঝখানে যে দেহটা বিরাজ করছে শেষ পর্যন্ত তার কোনো উল্লেখই নাই।

তেত্রিশ

এইসব গুরুতর ত্রুটির জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে গোঁড়া ফ্রয়েডবাদের স্থান দখল করেছে একধরনের পল্লবগ্রাহী পদ্ধতি। পুরুষ হোক নারী হোক, মানুষমাত্রই যে একধবনের বিচিত্র বহুচর প্রাণীর মতো যুগপৎ কয়েক গণ্ডা পৃথক পৃথক ভুবনে বাস করে এই অনিবার্য সত্য আমবা স্বীকার কবতে বাধ্য হচ্ছি ক্রমশঃ। আমরা যদি মনুষ্য-প্রকৃতিকে রাসায়নিক, মনস্তাত্ত্বিক, ভাষায় ব্যক্ত, ভাষাতীত, ব্যষ্টিগত, কৃষ্টিগত, গোষ্ঠীগত ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে যুগপৎ বিচার করি তাহলেই আমরা মানুষচরিত্রকে তত্ত্বেরদিক থেকে বুঝতে পারবো আর এই ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শিক্ষা বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবো। ফ্রয়েড মানবপ্রকৃতির সমস্যা বিচারের একটা ক্ষেত্রের একটা বিশেষ ভাগে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। এই দিকটা মনস্তত্ত্বের দিক। এই ক্ষেত্রের অন্যান্য অংশে অন্যান্য গবেষকরা যে কাজ কবেছেন, এবং এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব কাজ করা হয়েছে সেইসব কাজগুলির সঙ্গে ফ্রয়েডের আবিষ্কারের যৌতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজ চলেছে এগিয়ে।

চৌত্রিশ

আজ মানবচরিত্রের এক অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আকার নিতে চলেছে। দেহকারায় বন্দী অথচ দেহাতীত, স্বাধীন, অখণ্ড আত্মার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিংবা একটা স্বয়ংক্রিয় দেহযন্ত্রে কোনোরকমেলগ্ন আত্মার সহজবোধ্য কার্তেজীয় তত্ত্ব এই দুই তত্ত্বের সঙ্গে এই অভিনব আত্মার যতটা মিল, তার চেয়ে অনেক বেশী মিল তার হোমারকল্পিত সেই আত্মার সঙ্গে, যে আত্মা প্রকৃতিতে দৈহিক-মানসিক উপাদানেব সম্মিলিত বিতর্কসভার মতো।

কবি ব্লেক (Blake) তাঁর 'The Marriage of Heaven and Hell' ('স্বর্গ ও নরকেব পরিণয়') রচনায় দেকার্তেবাদ বিরোধী এবং প্লেটোবাদবিরোধী এই নতুন মতবাদের একটা আভাস দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টাব মতো।

সমস্ত বাইবেল, কিংবা শাস্ত্রীয় সূত্র নিম্নলিখিত ভ্রান্তির কারণ হয়েছে :

১। মানুষের অস্তিত্বেব প্রকৃতিসিদ্ধ হেতু দুটো—একটা দেহ একটা আত্মা।

২। পাপ নামক শক্তি শুধু দেহ থেকে উদ্ভূত ; পুণ্যনামক জ্ঞানের একমাত্র উৎস আত্মা।

৩। পাপকে অনুসরণ করার জন্য ঈশ্বর অনন্তকাল মানুষকে যন্ত্রণায় ফেলবেন।

উদ্ধৃত ঐ তত্ত্বগুলির বিপরীত এই তত্ত্বগুলি সত্য :

১। আত্মা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত কোনো দেহ নাই : কারণ যাকে আমরা দেহ বলি তা পঞ্চেন্দ্রিয়দিয়েউপলব্ধ

আত্মার অংশ মাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই জড়ের মধ্যে আত্মার প্রবেশ পথ।

২। শক্তিই একমাত্র জীবন, আর তার উৎস দেহ। জ্ঞান, এই শক্তির সীমানা, বাইরের পরিধি।

৩। শক্তিই অনন্ত আনন্দ।

এই সিদ্ধান্তগুলি যে শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাক্-আভাস তাই নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যের কার্যক্রমের ভিত্তিও এরা। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক অন্বেষক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ফসল সংগ্রহ করেছেন তার সহায়তায়, এবং 'আকস্মিক অভ্যুদয়বাদী' ও 'স্বয়ং সংগঠনবাদী' দার্শনিকদের (Philosophers of emergence and organisation) সহায়তায় সাহিত্যস্রষ্টা আজ এই কার্যক্রমকে অনুসরণ করার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। ব্লেকের যুগে দেহ থেকে আত্মা আর আত্মা থেকে দেহে রূপান্তরের তত্ত্ব দৃঢ় তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে যুগের এই তত্ত্বের ভিত্তিতে না ছিল কোনো উপযুক্ত দার্শনিক 'অবষ্টম্ভ' (buttress) না ছিল কোনো দার্শনিক ইমারৎ (superstructure)। আজ মৌলিক তথ্য ও সেই তথ্যরাশিকে তত্ত্বে সংহত করার মতো দর্শন, উভয়ই আমাদের আয়ত্তে। এরা উভয়ই নতুন রূপান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে। এরা সাহিত্যশিল্পীদের কঠিন কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে।

এই কঠিন কর্ম হোলো কৌমের ভাষাকে এমন ভাবে পরিশুদ্ধ করা যার ফলে এই ভাষা মনুষ্যপ্রকৃতির এমন একটা তত্ত্বের বাহন হবে যে তত্ত্ব পূর্বপূর্বশতাব্দীর কবিদার্শনিক ও আদিম বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত সমস্ত তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম এবং অনেক বেশী ব্যাপক।

পঁয়ত্রিশ

'বহুচর' অস্তিত্ব ও তার বহুধাউৎপত্তির সমস্যাকে যুগপৎ শিল্প ও বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করা দুষ্কর ও আয়াসসাধ্য। তার চেয়ে অনেক বেশী সহজ এবং কল্পনায় ইচ্ছাপূরণের অনেক বেশী উপযোগী উপায়, মানুষের সমস্যাগুলিকে একটা মাত্র কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা, কিংবা তার মীমাংসার জন্য সর্বোরোগহর কোনো স্বপ্নাগ্য ভৈষজ্যের বিধান দেওয়া। এই কারণেই আধুনিক কালে সাহিত্যশিল্পীরা মনোবিকলন তত্ত্বের প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক কম মনোযোগ দিয়েছেন সেই সব অপেক্ষাকৃত চমকহীন, অনাড়ম্বর অথচ অনেক বেশী জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বের দিকে, যাদের সাহায্যে শরীরবিজ্ঞানী, জৈবরাসায়নিক, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিদ্, সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদেরা বিপুল এক জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব একদেশদর্শী আর অতিমাত্রায় সরল বলেই তা এতো আকর্ষণীয়।

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আরও প্রামাণিক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আমাদের যে আকর্ষণ করে না তার কারণ এই যে, তা প্রকৃতিতে যথার্থই বৈজ্ঞানিক, এবং তা অতিজটিল প্রাকৃতসত্যকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সরল করতে অস্বীকার করে এবং জোর করে আমাদের দৃষ্টিকে তার বহুদিকের প্রতি আকৃষ্ট করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্যকর্মীরা অবৈজ্ঞানিক কোন গূঢ় বিষয় নিয়ে নিজেদের মাত্রাতিরিক্তভাবে পরিশ্রান্ত করতে রাজী তবু স্বভাবতঃ ন্যূনরহস্য বৈজ্ঞানিক তথ্যকে শিল্পের অঙ্গীভূত করার জন্য সমপরিমাণ পরিশ্রম করতে রাজী নন। এজ্‌রা পাউণ্ড-

এর (Ezra Pound) "Near Perigord" (পেরিগর্দের কাছে) কবিতার প্রথম কয়েকটা পঙ্‌ক্তি এর একটা দৃষ্টান্ত।

'পেরিগরে চলো,
প্রাচীরেব কাছে
কপর্দক হাতে নিয়ে
হোথা মিলবে ঠাঁই! (*)' (৪৬)
মশায় 'চিনো', তুমি চেয়েছো
মানুষেব হৃদয় ঝেড়ে ধূলি উঠে এসে
তাদের গূঢ় কথা জানাবে তোমাকে!
ঠিক, না?
তাহ'লে এককাজ করো
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ো
সন্ত 'অমুকেব' বচনা (?)
তাবপব উত্তবটা বলে দাও আমায়,
কাবণ, একমাত্র তুমিই
জানো সে কাহিনীটা! (৪৭)

এই ভাবে গোটা কবিতাটা এগিয়ে চলেছে। এ যেন আধুনিক সজ্জায় পবিবেশিত ব্রাউনিংয়েব (Browning) কবিতা! কিন্তু এই আধুনিক আলখাল্লাটায় প্রভঁ্যাসাল (Provencal) বা ত্রুবাদুরদের ভাষাব ট্যানার টুকবো বসানো, আর তাব এখানে ওখানে মধ্যযুগের নানাধরণের উদ্ভট কথার ঝালব ঝল্ ঝল্ করছে। এর বক্তব্যকে যথার্থ অনুধাবন করতে গেলে প্রথম অংশের উদ্ধৃতিটার আর ঐতিহাসিক অনুষঙ্গগুলোর অর্থোদ্‌ঘাটন করতে হবে। কিন্তু এই অর্থোদ্‌ঘাটনের জন্যে পাঠককে সেই পরিমাণ বেগ পেতে হবে যে

* প্রভঁ্যাসাল ভাষায় রচিত, অনুবাদ আনুমানিক।

পরিমাণ বেগ পেতে হবে তাকে Nature পত্রিকার বা Archives of Neurology ("স্নায়ুতত্ত্ব সংবাদ") পত্রিকার কোনো নিবন্ধের মর্মোদ্ধার করতে।

বলাই বাহুল্য যে, বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষ ও তার বিষয় বস্তুর মধ্যে সরাসরি কোনো ইতরেতর সম্পর্ক নাই। তুচ্ছ ঘটনা বা অতিসাধারণ ভাব অনেক অমর রচনার বিষয় হয়ে আছে। পক্ষান্তরে, প্রতিভাহীন অথচ সদিচ্ছাপ্রণোদিত লেখকের হাতে পড়ে উচ্চকোটির বিষয়বস্তুও বিস্বাদ সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে যদি সমান পর্যায়েব প্রতিভা প্রযুক্ত হয়, তাহলে যে বিষয় নিজগুণে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তার আশ্রয়ে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তা আকর্ষণহীন তুচ্ছবিষয়বস্তু-আশ্রিত সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশী শ্রেয়স্কর। মানুষের বহুচর অস্তিত্বের সনাতন প্রশ্নের মীমাংসায় বিজ্ঞানের ছাত্রেরা যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ও যে সব তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, সেই তথ্য ও তত্ত্ব আমার কাছে এজরা পাউণ্ডের কবিতার বিষয়রূপে ব্যবহৃত মধ্যযুগীয় গল্পকথার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশী আকর্ষণীয়। এই কবিতাটির সমাদর আমিও করি। তবু আমি বেশী তৃপ্তি পেতাম যদি এই কবিতার রচয়িতা, এই অতিউত্তম শিল্পী এবং আমার কৌমের ভাষার এই কুশলীতম পরিমার্জক, যদি তাঁর প্রতিভাকে বর্তমান বিজ্ঞানের কোনো বিষয়কে নবরূপ দিতে প্রয়োগ করতেন এবং এই ভাবে এই নতুন ধরনের উপাদানকে চিরায়ত প্রসঙ্গগুলির পাশাপাশি উচ্চতম সাহিত্যশিল্পে স্থান দিতেন।

বহুচর মানুষ কিন্তু কখনোতীব্র এবং কখনোমৃদু একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে বাস করে। মনুষ্যজাতির যথার্থ অনুশীলনের বিষয়, "মানুষের নিরয়গামিতা আর তার উর্ধ্বগমনের আবেগের মধ্যে" সদাসংঘটিত দ্বন্দ্ব। এই অনুশীলন

মানুষের ক্লান্তিকর বিধিলিপির অনুশীলন।
তার জন্ম এক বিধিতে, তার বন্ধন অন্যে।
মোহে তার জন্ম, তবু বারণ তার মুগ্ধ হতে!
রুগ্নতায় সৃষ্টি, কিন্তু আদিষ্ট সে অরুগ্ন হ'তে!

ফুলক্ গ্রেভিল (Fulke Greville) তাঁর কবিতার চরণ শেষ করেছেন একটা প্রশ্নে :

কী অর্থ বোঝাতে চায় প্রকৃতি
নানা এই বিধির বিরোধে?
কেন এই আবেগ আর বুদ্ধির বিরোধ?
কেন তার নিজেই নিজকে ভাগ করা?

ঈশ্বরতত্ত্ব, পরাবিজ্ঞানতত্ত্ব কিংবা প্রাচীন শবীরতত্ত্ব এই প্রশ্নের যে সব উত্তর জুগিয়েছে সেই সব উত্তরের সঙ্গে বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান ভিন্নধরনের উত্তর সংযোজন করছে। এই "নিরয়গামিতা এবং উর্ধ্ব আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব" ঘটছে, তার কারণ, প্রাচীন মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্বাচীন, অথচ অতিবর্ধিত, করটেক্স বা আবরণ ; তাব কারণ, আরণ্যক জীবনধারণের প্রয়োজনে উদ্ভূত এণ্ডোক্রিন বা অন্তঃস্রাবতন্ত্র, বর্তমানে সম্পূর্ণগৃহপালিত এবং কথার খাঁচা তথা কৃষ্টির বৃহত্তর খাঁচায় বন্দী নরনারীর দেহে, এখনো অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বর্তমান।

ব্যক্তির পক্ষে অবস্থটা আরও জটিল হয়েছে, তার কারণ দৈহিক গঠন আর রাসায়নিক জৈবক্রিয়ার দিক থেকে সে একেবারেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। অপরের সঙ্গে মিলের মতোই অপরের থেকে পার্থক্যও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে এই পার্থক্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাসূত্রগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে। ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পরাবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও কিছু প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে ছিল না। ঈশ্বর-

তত্ত্ব ও পরাবিজ্ঞানেব দৃষ্টিতে, আমাদেব অন্তর্লোকে যে চিবস্থায়ী অন্তর্বিপ্লব এবং তাব ফল স্বরূপ যে উদ্বেগ, ক্রোধ, হতাশা ইত্যাদি, শুধু তাবাই প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতাব বিষয়।

ঈশ্বব, শয়তান, পাপ, বিবেক, মৌলিক মননবর্গেব নির্দেশ (categorical imperative), কর্ম, ঈশ্ববইচ্ছা বা নিয়তি, ইত্যাদি ধাবণাশ্রিত যে ব্যাখ্যা তা বৈজ্ঞানিকদেব উদ্‌বর্তনতত্ত্ব, স্নায়ুতন্ত্র এবং সামাজিকসমানুবর্তিতাব সঙ্গে সততবিবোধবত জৈববাসায়নিক অনন্যতা, ইত্যাদি আশ্রিত যে ব্যাখ্যা, তাবই মতো যৌক্তিকতায় সার্বজনিক (rationalisticlly public)।

সার্বজনিক কোনো একটা বিশেষ তত্ত্ব ব্যক্তিবিশেষেব মনে তীব্র প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি কবতে পাবে। অতীতে অনেক কোমলমতি মানুষ সংকীর্ণ স্থানীয সংস্কৃতিব বিধানেব লঙ্ঘন জনিত যে পাপ সেই পাপেব ফলে অনন্ত শাস্তিব শাস্ত্রপূত ধাবণাকে গভীবভাবে বিশ্বাস কবেছেন, ও ফলে গভীব অবসাদ ও আত্মক্ষযী হতাশাব তীব্র আক্রমণেব সম্মুখীন হয়েছেন। নবক সম্পর্কে প্রচলিত সার্বজনিক ধাবণাব প্রতিক্রিযাব ফলে ব্যক্তিমনে যে হতাশাব উদ্ভব হয় সেই হতাশাব বদলে পাপস্খালনেব সার্বজনিক যে কল্পনা তা ব্যক্তিমনে আশ্বাসও সৃষ্টি কবতে পাবে। এমনি ভাবেই লিয়েলেব (Lyell) ভূতত্ত্ব এবং ডাবউইনেব (Darwin)-এব অভিব্যক্তিবাদরূপ সার্বজনিক ধাবণাব প্রতি দুধবনেব ব্যক্তিগত প্রতিক্রিযা হতে পাবে। কোনো ব্যক্তিব ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াব ফল হতে পাবে এক ধবনেব শোকাবহ ক্ষতিব খেদ, আব তাব সঙ্গে নিষ্করুণ সৃষ্টিতে নিদারুণ একাকীত্বেব অব্যক্ত অনুভূতি।

বর্তমান বিজ্ঞান মনুষ্যধর্মেব যে বিববণ দিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিব মনে তাব প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। কোনো মনে যন্ত্রণা, কোনো মনে উল্লাস, কোনো মনে ঔদাসীন্য। কাব মনে কোন্ ধবনের প্রতিক্রিয়া

হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব ও শিক্ষার ওপর। আসল কথা এই যে, মানুষের বহুলোকচরতার বৈজ্ঞানিক কল্পনা নিতান্ত অনুমান নির্ভর এবং যৌক্তিকতার দিক থেকে সার্বজনিক হলেও, বিশেষ সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালা বিশেষ ব্যক্তির মনে এই তত্ত্ব আনন্দ বা ক্লেশ, অতীতমুখী চিত্তের অবসাদ বা অনাগত ভবিষ্যতের আশার সৃষ্টি করতে পারে। অতীতে সাহিত্যশিল্পীরা অতি সহজেই ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরাবিজ্ঞানের অতিঘরোয়া মানবিক নাট্যরসে অভিষিক্ত, অতিঘরোয়া মানবিক রূপরেখায় ছবিল তত্ত্বগুলিকে তাঁদের কবিতায়, নাটকে, কাহিনীতে আত্মসাৎ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দেখতে পাই মানুষের আন্তরলোকের আবহাওয়ার সেই চিরচমৎকার বর্ণনা, তার অনুভবের দ্রুত তানবদল, তার জীবনদর্শন আর সদসদ্‌বিচারবোধের দ্রুত পরিবর্তন! এই সব একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে জর্জ হারবার্ট (George Herbert) কত সহজেই না তাঁর নিতান্ত সার্বজনিক বিশেষ ধর্মমতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন! তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন: 'কে জানতো, আমার এই বলিকুঞ্চিত হৃদয় আবার যৌবনকে ফিরে পাবে?' তাঁর হৃদয় সত্যসত্যই আবার হরিৎ হয়েছিল। যার ফলে, 'আমার এই জরায় আবার কোরক বেরুচ্ছে, অনেক মরণের পর আমি আবার বেঁচে উঠে লিখতে বসেছি।'

> 'সর্বশক্তিমান, এই তো তোমার অলৌকিক লীলা!
> তোমার একহাতে ধ্বংস আর একহাতে পুনর্জন্ম,
> একহাতে টেনে আনছো নরকে
> আবার অন্যহাতে টেনে তুলছো অমরাবতীতে
> এক প্রহরের ব্যবধানে!' (৫০)

আর এক দৃষ্টান্ত: 'কী ঐশ্বর্য্য, কী সজীবতা তোমার আবি-

ভাবের!' (হেনরি ভগানের (Henry Vaughan) কবিতা থেকে উদ্ধৃত)।

> এই একটু আগে আমার মুমূর্ষু লতাগুলো
> ধূলিধূসর হয়ে ক্লান্ত নৈরাশ্যে এলিয়ে পড়েছিল,
> তারপর সেই তাদের মুমূর্ষুতার 'পরে
> তোমার মধুবর্ষী দৃষ্টি ঝরল,
> অমনি আমি বেঁচে উঠলাম
> অমনি ভরে উঠলাম স্বাদে ও সৌরভে! (৫১)

এই দুটি অপূর্ব সুন্দর কবিতায় ব্যক্তির একান্ত অনুভূতির সঙ্গে একটা ধর্মীয় দর্শনের সার্বজনিক বিশ্বদৃষ্টি গেছে মিলে। এই দর্শনে মানুষের অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা ব্যাখ্যাত হয়েছে দৈবের হস্তক্ষেপ দিয়ে। বিংশশতাব্দীর মানুষের পক্ষে এই লোভনীয় সহজ পথটা রুদ্ধ। এই মুহুর্মুহু রূপান্তরের কোনো তত্ত্বকে যদি আজকের দিনে কোনো আধুনিক কবিতার অঙ্গীভূত করতে হয়, তাহলে সেই তত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। এই স্বর্গ এই নরক; এই চৈত্রের প্রভাত এই মাঘের মধ্যরাত্রি; এই ধরনের অব্যক্ত অনুভবঅনুক্রমের অধীন আমরাও। অন্তর নিভৃতের এই সব অনুভবকে হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন কোনো দেবতা বা দানবের ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হয়। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ লৌকিক অনুমানের ভিত্তিতে একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, এই সব অনুভূতি কায়ার অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনার ফলমাত্র। আমরা জেনেছি যে, উল্লাস এবং হতাশার একটা এন্‌ডোক্রিনোলজি বা আভ্যন্তর গ্রন্থীরসতত্ত্ব আছে। ধ্যান উপলব্ধির পিছনে একটা রসায়ন আছে, আর স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ দিয়ে বিচার করলে, এই মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল অনুভূতির একটা আবহাওয়াবিজ্ঞান আছে, আর অধ্যাপক পিকার্ডির (Piccardi) মতে এদের একটা নক্ষত্রবিজ্ঞানও (astrophysics) আছে।

ঈশ্বরতত্ত্বের ও পরাবিজ্ঞানের কথাপ্রবন্ধ দিয়ে রচিত নিতান্ত ভাবময় যে জগৎ কল্পনা, সেই জগতের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মতর এবং অনেক জটিলতর জগতের বিবৃতি দেয় আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি। এই বিজ্ঞানকল্পিত জগৎ মানুষের প্রকৃতি আর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে বটে, কিন্তু এই জগৎ মানুষের বাইরে। এর মধ্যে না আছে নাটকের চমক, না আছে চিত্তবৃত্তির কোনো লক্ষণ।

এই সব কারণে বৈজ্ঞানিকতত্ত্বগুলিকে একটা সুসমঞ্জস, মর্মস্পর্শী এবং প্রত্যয়ধন্য শিল্পরচনার অঙ্গীভূত করা দুঃসাধ্য। "দানো পাওয়ার" ধারণা কিংবা নিজের সৃষ্ট আত্মার মধ্যে যে ঈশ্বর মারণ ও জীয়নের কাজে রত সেই ঈশ্বরের ধারণাকে শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত করার চেয়েও এ কাজ অনেক বেশী দুঃসাধ্য। কিন্তু, যে শিল্পী নিজের বৃত্তিতে নিষ্ঠাবান এবং প্রতিভাশালী, তাঁর পক্ষে এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। এই দুঃসাধ্য যেন বুদ্ধিকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং আরও সিদ্ধির প্রেরণা জোগায়। যে ধরনের ধারণা ও শব্দ-সন্দর্ভের অস্ত্র দিয়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে, তা আজো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। আমরা এখনো জানিনা, আর যতদিন না কোনো মহৎ শিল্পী এসে হাতেনাতে করে দেখিয়ে দিচ্ছেন ততদিন জানবোও না, কীভাবে গোষ্ঠীর ঘোলাটে বাক্‌সরঞ্জাম আর পাঠ্য পুস্তকের আষ্টে-পৃষ্ঠেবাঁধাঅর্থের শব্দগুলিকে কাজের উপযুক্ত করে পরিশুদ্ধ করতে হয়, যার ফলে এই সব কথার আশ্রয়ে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত অব্যক্ত অনুভূতি এদের বৈজ্ঞানিকতত্ত্বগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে যাবে। তবু ভবিষ্যতে একদিন না একদিন এই অসাধ্য সাধনের উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। উপযুক্ত আশ্রয় নির্মিত হবে। সেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত প্রতিভাবান পথ-প্রদর্শক একদিন আবির্ভূত হবেন, এবং অতিস্বচ্ছন্দে এর পথটা দেখিয়ে দেবেন। যখন তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন তখন সেই

পথটাকে সব চেয়ে সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হবে। সে পথ কী হবে সে সম্বন্ধে এখন কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীই করা যাচ্ছে না। সেক্‌স্‌পীয়র নাটক নিয়ে কী করবেন না করবেন, সে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে গেলে সমালোচককে আর একজন সেক্‌স্‌পীয়র হ'তে হবে। আর, যদি এমন সমালোচক কোনোদিন আসেনও, তিনি এসে এই নতুন সাহিত্য সম্পর্কে বিতণ্ডায় অবতীর্ণ না হয়ে এই সাহিত্য রচনা করেই দেখিয়ে দেবেন।

ছত্রিশ

মানুষের আলোচনার সবচেয়ে যোগ্যতম প্রসঙ্গ মানুষ স্বয়ং। মানুষ ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রসঙ্গ, তার মধ্যে সব চেয়ে উপযুক্ত হোলো প্রকৃতি, মানুষ যে প্রকৃতির একটা প্রকট অংশ মাত্র। আর, প্রজাতিরূপে বাঁচতে গেলে এবং ব্যষ্টি আর সমষ্টি মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার মধ্যে যা শ্রেয় তাকে রূপায়িত করতে গেলে, সেই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে হবে তাকে। এখন প্রশ্ন, এই বিরাট স্বষ্টির জন্য সাহিত্যশিল্পীকে নূতন শিল্পস্বষ্টির উপযুক্ত কী উপাদান জোগান দেবে বিজ্ঞান? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করা যাক পরিবেশবিজ্ঞান ও তার কার্যকরী প্রয়োগ নিয়ে। এই বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ—যথা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও তার সদ্ব্যবহার, অনিষ্টকারীকীটপ্রতিরোধ ব্যবস্থা, প্রতিকূলঅবস্থাসহিষ্ণু উদ্ভিদ্ ও প্রাণীব স্বষ্টি, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকর উদ্ভাবন এবং আরো অন্যান্য সব উপায়, যাদের সাহায্যে মানুষ তার প্রাকৃতিক বাতাবরণের সঙ্গে একটা সুষম সম্বন্ধ বজায় করতে কিংবা উপযুক্ত নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এই সব বিদ্যা আর যে তথ্যরাজি ও তত্ত্বের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব ও তথ্য শুধু যে নিজেদের মূল্যেই আকর্ষণীয় তাই নয়, তাদের নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক এবং জড়পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তার সঙ্গে প্রজাবৃদ্ধি, ধ্বংসাত্মক কৃষিকর্ম, মূঢ়ের মতো অরণ্য ব্যবহার, চারণ ভূমির নাশ, জলবায়ুর কলুষীকরণ আর উর্ব্বী ভূমির উর্ব্বরতার সম্পূর্ণ বা আংশিক

নাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে যা আমরা ঠেকে শিখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে, আজ এটা পরিষ্কার হয়ে প্রতিভাত হয়েছে যে, "সংযমের সোনার নিয়ম" শুধু যে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রযোজ্য তাই নয়, এ নিয়ম অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় এবং যে গ্রহের কোলে চড়ে আমরা স্থানকাল পরিক্রমা করছি সেই গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

অপরের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করো তেমনি ব্যবহার করো অপরের সঙ্গে। আমরা কী প্রকৃতির কাছ থেকে সদ্‌ব্যবহার আশা করি? তা যদি করি, তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে আচরণ তাকেও সৎ হতে হবে। মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার সব সময় পাপ বলে কীর্তিত হয়েছে। তেমনি অনেক ধর্মে প্রকৃতির সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহারকেও পাপের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। এরা অবশ্য সে সব ধর্ম নয় যে সব ধর্মের তত্ত্বে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগৎ থেকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকৃত। যে সব ধর্মে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র, সেই সব ধর্মের বিচারে প্রকৃতির প্রতি মানুষের অমানুষিক ব্যবহারকে উপেক্ষা করা হয়েছে। গোঁড়া ক্যাথলিকপন্থী ঈশ্বরতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, মনুষ্যেতর প্রাণীরা নিরাত্ম, অতএব তাদিকে জড়পদার্থের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে। আজকের বিজ্ঞান যে সব ধর্মনীতি আর দার্শনিক তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করছে তারা প্রকৃতিতে যতটা খ্রীষ্টীয়ভাবাপন্ন তার চেয়ে অনেক বেশী বৌদ্ধভাবাপন্ন। পিথাগোরাস (Pythagoras) আর প্লেটোর (Plato) ভাবধারার সঙ্গে এর যতটা মিল, তার চেয়ে এর অনেক বেশী মিল 'টোটেমীয়' দৃষ্টি ভঙ্গি বা গণচিহ্ন (totem) আশ্রিত সমাজসজ্ঞানতার সঙ্গে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চোখে প্রকৃতির প্রতি মানুষের অমানুষিকতা মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিকতার মতোই গর্হিত। প্রাণীকে পদার্থমাত্ররূপে বিবেচনা

করে তাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করা শুধু যে নীচতম ক্রূরতা তাই নয়, তা নিকৃষ্টতম মূঢ়তাও। প্রাণীদেরও ধরিত্রীর বিস্তৃত বিপুল প্রাণময় অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিবেচনা করতে হবে। এই বিপুল প্রাণময় অস্তিত্বের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন মানব-সমাজকে পেশীরূপে কিংবা বিশেষ অঙ্গরূপে দেখতে হবে। এই পেশী আর বিশেষ অঙ্গ অনেক সময় ভয়ঙ্করভাবে ব্যাধিগ্রস্ত এবং সদাসংসরমান গরলে চালনির মতো শতচ্ছিদ্র।

গ্রীক পুরাণের ভাষায় যা 'হুব্রিস' বা সর্বনাশপ্রবণতা, সেই অসংযত অভিমানস্ফীত ঔদ্ধত্য আজকের সভ্যমানুষের একটা ঘৃণিত চরিত্র লক্ষণ। এই হুব্রিস যখন অন্য মানুষের প্রতি প্রেরিত, তখন তা যেমন পাপ তেমনি সে পাপ যখন তা প্রকৃতির দিকে ধাবিত। গ্রীকদের স্বভাবজাত নীতিবোধের এই মৌলিক সত্য আজকের দিনে বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা সমর্থিত। গ্রীকদের সর্বব্যাপারে পরিমিতিবোধ, একদেশদর্শিতা ও আতিশয্যের প্রতি বিরাগ—এরাও সমর্থিত হয়েছে আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে। আমরা এখন জেনেছি যে, প্রকৃতি একটা সাম্যাবস্থা থেকে আর এক সাম্যাবস্থায় উত্তীর্ণ হতে হতে চলেছে। প্রকৃতির একটা সাম্যাবস্থা যখন বিঘ্নিত হয়, তখন প্রকৃতির শক্তিচয়ের মধ্যে আর একটা সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। 'মধ্যপন্থার' যে আদর্শ প্রাকৃতিক নিয়মই তার ভিত্তি। বিশেষ শ্রেণীর পর্যবেক্ষিত তথ্য আর বিশেষ শ্রেণীর অনুভবগ্রাহ্য সদসৎ অর্থের (values) মধ্যে কতকগুলি যোগাযোগের সেতু চোখে পড়ে। সাহিত্য-শিল্পীর মুখ্য বিচার্যবিষয় মানুষ, আর তার পরবর্তী পর্যায়েই প্রকৃতি।

তাই তাঁর কাছে এই যোগাযোগের সেতুগুলি অমূল্য। যে দুটো জগৎকে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে এসেছি সেই দুটো জগতের মাঝখানে যে ক্ষেত্র, সেখান থেকে তিনি নতুন ধরনের প্রকৃতি-সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পাবেন।

সাঁইত্রিশ

তর্কের যে জগৎ এবং সংবেদের যে জগৎকে আমরা এতকাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও বিষমধর্মী বলে জেনে এসেছি, বিজ্ঞান কখনো তাদের মাঝখানে সেতু নির্মাণ করে, আবার কখনো অনেক পুরানো সেতুকে ভেঙে ফেলে, যে দুটো বিশ্ব চিরাচরিত ধারণায় একাকার বলে পরিচিত ছিল, তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দুস্তর ব্যবধান। আমরা আগেই দেখেছি, ব্লেক (Blake) ও কীট্‌স্ (Keats) আইজাক নিউটন (Isaac Newton)-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এই কারণে যে, আইজাক নিউটন নক্ষত্র ও দিব্যসত্তাদের মধ্যে যে পুরানো যোগাযোগ ছিল তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, এবং ইন্দ্রধনু আর আইরিস (Iris) এর মধ্যে সম্বন্ধকে অলীক প্রতিপন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিউটন মানুষের ভুবন থেকে তার কাব্যময়তাকে নিষ্কাষিত করে তার অর্থকে অপহরণ করেছিলেন। কিন্তু আজ এই বিজ্ঞানের যুগে, জগৎকে জগৎবহির্ভূত সত্যের স্থলাভিষিক্ত বিভিন্ন প্রতীকের সমাহার ব'লে আর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। "যা কিছু নশ্বর তাই কিছু প্রতীক নয়"। জগৎ তার নিজস্ব প্রকৃতিতে কাব্যময়। তার অর্থ সে নিজেই। জগতের গৌরব তার অপরিমেয় রহস্য, এবং মানবচেতনায় সেই রহস্যের প্রত্যভিজ্ঞা। যা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) ভাষায় আরও গভীরে অন্তর্লীন, যা অস্তায়মান সূর্যের কিরণজালে এবং মানুষের অন্তঃকরণে বিরাজমান সেই আরও-গভীর, আরো-সনাতন তত্ত্ব, প্রচলিত পৌরাণিক বিষয়বস্তুর চেয়ে, জীবন ও জীবনপোষকশিল্পরচনার গভীরতর, দৃঢ়তর, স্থিরতর ভিত্তি।

তবু এখনো পর্যন্ত "মিথ" বা উপকথা টিকে রয়েছে। এখনো মানুষের মনে এমন কিছু আছে যা মিথের আবেদনে সাড়া দেয়। কিছু আছে, যা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় উল্লিখিত সেই নামহীন বিরাটের তুলনায় অত গভীরে অন্তর্লীন না হলেও, এই নামহীনের তুলনায় অনেক বেশী পরিবর্তনশীল হলেও, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতিকে বিষয় করে লেখার পূর্বে আধুনিক কালের সাহিত্য-শিল্পী একটা চিত্তাকর্ষক সমস্যার মুখোমুখী হন। এ সমস্যা, পুরাকালের উপকথাস্রষ্টাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুরানো মনোহরণ উপাদানের সঙ্গে, আজকের বিজ্ঞানক্ষেত্র থেকে প্রসূত বিভিন্ন জ্ঞানধারায় যে সব নূতন তথ্য ও তত্ত্ব বয়ে আসছে সেই সব উপাদানকে, একই শিল্পকর্মের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়ার সমস্যা।

এই সমস্যাকে একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিচার করা যাক। বিংশ শতাব্দীব এই দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী ভাষার সাহিত্যকর্মীর পক্ষে "নিশিবুলবুল" (nightingale)-এব বিষয়কে কী ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব? প্রথমেই দেখতে পাই, ইংলণ্ডের সবুজ গাছের বেড়ায় পিবীচ দিয়ে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ছিটানোর ফলে নানাশ্রেণীব শুঁয়োপোকার ঝাড় শেষ হতে বসেছে। ফলে, এই পোকারা যাদের আহার, সেই বুলবুল, শূককীটভোজী কোকিল, আর সেই রূপান্তরিত শুক-কীট প্রজাপতিরা, আজ সেই দেশেই প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছে যে দেশে তারাই ছিল দেশময় সবচেয়ে ব্যাপ্ত কাব্য উপাদান। শুধু এই বিষয়টা নিয়েই বেশ বড় পরিসরের একটা মূল্যবান প্রবন্ধ কিংবা একাধারে আবেগ ও মননমিশ্রিত একটা কবিতা, কিংবা কোনো একটা প্রুস্তপন্থী (Proust) উপন্যাসের একটা সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ, রচিত হতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আজ এমন সব রাসায়নিক পদার্থ পেয়েছি যেগুলোকে ছিটিয়ে দিলে আগাছারা

বিনষ্ট হয়। এগুলো ছিটিয়ে দিলে আগাছা যাবে ঠিক, কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত হবে কাব্যানুভূতি, আর কাব্যব্যঞ্জনার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। মানুষকে কাজ করতেই হবে, কিন্তু একথা তার ভুললে চলবে না যে, নিজেদের কাজের সুদূর ভবিষ্যপরিণতির পূর্বানুমান তার সাধ্যের অতীত। আগাছা না থাকলে শুঁয়ো পোকা থাকবে না। আর, শুঁয়ো পোকার অভাব হলে মধুর কণ্ঠ বুলবুলও থাকবে না; থাকবে না তার বিরহবিধুব গান আর থাকবে না সেই মায়া ভুবনের দিকে খোলা বাতায়ন। আমাদের এই জগতে কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীতে কোনো কৃষিক্ষেত্র থেকে কিছু ফসল পেতে গেলে আগে ভাগে তার দাম হিসেবে কিছু ছড়াতে হয়। এই দাম হয় সঙ্গেসঙ্গেই চুকিয়ে দিতে হয়, কিংবা অনেক দিন ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে হয়।

বুলবুলির কাব্যরচনার সমস্যায় বিজ্ঞান শুধ্ যে পিরীচে ছিটানো রাসায়নিক জোগান দিয়েছে তাই নয়, পক্ষিআচরণপর্যবেক্ষক ও প্রাণীব্যবহারবিদদেব কল্যাণে আজ আমরা বুলবুলের গানের বিষয়ে অতীতের তুলনায় অনেক বেশী জেনেছি। এই অমর বিহঙ্গ (আগাছা নাশক রাসায়নিকের প্রয়োগের ফলে এই অমর বিহঙ্গ প্রায় মবমর) এখনো, যেখানে শুঁয়োপোকারা যথেষ্ট প্রতুল সেখানে গান করে, আর এই গান অনাদিকালের সেই আবেগবিহ্বল পুরানো গান! এখনো ঘনহয়েআসা আঁধারে আমরা কান পেতে থাকি:

> তুমি যবে আত্মাকে তোমার
> ঢেলে দাও অঝোর ধারে আশ্চর্য্যরভসে। (৫২)

এখনো ভরা জোৎস্নায় আমরা কান পেতে থাকি, যখন

> গাছের পাতার ভীড় ঠেলে
> তোমার গানের দমক আসে
> উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে!

আবার শোনো,

অসীম কালের আবেগ !

অসীম কালের বেদনা ! (৫৩)

শুনতে শুনতে পুরানো উপকথা মনে পড়ে ;

তুমি কি নতুন করে দেখছো

এই খানে এই ইংলণ্ডের শাদ্বলে গড়িয়ে পড়া

জোৎস্নার জালের মধ্য দিয়ে—

সেই শত্রুপুরী, থ্রেসের মরুর মধ্যে ?

তুমি কি পড়ছ নতুন ক'রে

উত্তপ্ত কপোলে, জ্বালা নিয়ে চোখে,

তন্তুবোনা সুস্পষ্ট অক্ষরে

তোমাব সেই অনুজার কলঙ্কের কথা ? (৫৪)

কিংবা, কবি তাঁর মনোযোগকে এই বীভৎস গ্রীক অপরাধকাহিনী, এই কুৎসিতকামিতা আর অলৌকিক হস্তক্ষেপের কাহিনী থেকে সরিয়ে নিয়ে, অন্য একটা মনোরম উপকথায় নিবদ্ধ করতে পারেন।

তিনি এবার শুনছেন আর ভাবছেন ঃ

হয়তো এ সেই গান

যা রুথের বিষণ্ণ মর্মে

বেজেছিল

যখন সে প্রবাসে

পরিপক্ক শস্যভরা ক্ষেতে

বিগলিত অশ্রুর প্রবাহে

দাঁড়িয়েছিল

দূরগত গৃহের বিরহে একান্ত আতুর ! (৫৫)

কীটসের এক শতাব্দী পরে এবং ম্যাথু আরনল্ডের (Mathew

Arnold) অর্ধশতাব্দী পরে টি, এস, ইলিয়ট (T. S. Eliot) ইংরাজী কবিপ্রেরণায় আর কাব্যদৃষ্টির এই অনুশ্রুত পুরানো উপাদানকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন। তিনিও লিখেছেন 'ফিলোমেল' (Philomel)-এর কথা। বর্বর রাজার কামে ধর্ষিতা হোলো ফিলোমেল (Philomel) :

তবু, সেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি
ভেসে গিয়েছিল বুলবুলির কণ্ঠস্বরে,
যে কণ্ঠস্বর বলাৎকারের স্পর্শের বাইরে।
ফিলোমেল এখনো চীৎকার করে
এখনো জগৎ ধায় পিছু পিছু,
স্বর তার বাজে পাপমলিন শ্রুতিতে
এখনো, এখনো! (৫৬)

আর, কী স্বভাবক্লিন্ন, কী স্বভাবঅশুচি এই কানগুলো! সুইনির (Sweeny) কান, শ্রীমতী পোর্টারের (Mrs.Porter) কান, কুমারী রাচেল (Rachel) পরে শ্রীমতী রাবিনোভিচের (Rabinovitch) কান!

তবু বুলবুলরা গাইছে গান
পবিত্র হৃদয়ের বিহারের কাছে।
এরা তখনো গেয়েছিল
রক্তাক্ত বনানীতে
আগামেম্নন যখন
চীৎকার করে উঠেছিলেন
ঘাতকের আঘাতে
উচ্চৈঃস্বরে!

তাদের কণ্ঠের তরল ঝরেছিল বিন্দু বিন্দু,
আর সেই বিন্দু বিন্দুতে ধরেছিল দাগ
অন্যায় হত্যায় লাঞ্ছিত সেই
শবের আচ্ছাদনে! (৫৭)

ঘুরে ফিরে আবার আমরা ফিরে এলাম সেই প্রাচীন পাপ, সেই কুৎসিতকামিতা আর অলৌকিক হস্তক্ষেপের কাহিনীতে! ইলিয়টের বুলবুল বর্ণনার যা একমাত্র নূতনত্ব, তা অশুচিকাম ও 'পবিত্র হৃদয়ের বিহারের' সান্নিধ্যের উল্লেখ।

আগামেম্‌নন ও দাউলিসের অধিপতি ; সুইনি ও মার্জরীমারী আলাকক (Marguerite-Marie Alacoque) ; আধুনিকতার ক্লেদ, বর্বরতা ও ক্ষয়িষ্ণু মধ্যযুগের 'বারোক' বা পচিষ্ণু ধর্মবাতিক —এইসব উপকথারূপ তীব্র অনুনাদী স্বর (upper partials), কৃষ্টিধারাগত প্রসংবাদী স্বর (harmonics) এবং বিদ্রূপের কোমল অনুনাদী স্বর (undertones) ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই অমর বিহঙ্গের গান এই আধুনিক কবিপ্রবরের কানে ধ্বনিত হয়েছে।

বন্ধ্যাভূমি (waste land) আর বুলবুল আর সুইনি (Sweeney among the Nightingales) পড়ে পাঠক অনুমান করতে পারবেন না যে এই কবি ইলিয়ট হাওয়ার্ড (Eliot Howard) ও কনরাড লরেন্স্ (Konrad Lorenz)-এর সমসাময়িক। যখন তিনি ফিলোমেলার কথা বলছেন তখন তিনি আর্নল্ড ও কীটসের ভাষায়ই কথা বলছেন, অর্থাৎ মানুষী অনুভবচালিত এই পাখিকে শুধুমাত্র একটা বিশেষ কৃষ্টির বাতাবরণের মধ্যেই দেখছেন। কবি ইলিয়ট যখন লিখছিলেন, বিংশশতাব্দীর সেই দ্বিতীয় দশকে, পাখিদের সঙ্গীতপ্রেরণার কারণগুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেছে। হাওয়ার্ড (Howard) আর তাঁর সহযোগী বাতাবরণ-

বিজ্ঞানীরা (ethologists) ইতিমধ্যেই বুলবুলের (nightingale) সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের মর্মার্থ ও তার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। বিশ্বপদার্থের পরিমাপ মানুষেরই মাপে। একথা আমাদের পক্ষে কী নিদারুণ সত্য! তেমনি বুলবুলদের বেলায়ও বুলবুলজগতের পরিমাপ বুলবুলদের মাপেই। বাঘের জগৎ বাঘের নিজস্ব মাপেই তার চক্ষে প্রতিভাত। আজকের বাতাবরণবিজ্ঞানীরা (ethologists) এই সত্যটা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেছেন এবং সফলভাবে ওর প্রয়োগ করেছেন। এটাই বিজ্ঞানেব জয়। স্ত্রীবুলবুল বা ফিলোমেল (Philomel) গায়িকা নয়, তার দয়িত যে পুরুষ বুলবুল সেই আসল গায়ক। পুরুষ বুলবুল যখন গান গায়, তখন সে গান গেয়ে বেদনা প্রকাশ করে না, শৃঙ্গারআবেগ কিংবা রভস প্রকাশ করে না, গান গেয়ে সে অন্যান্য পুরুষপক্ষিদের উদ্দেশ করে এই ঘোষণা জারী করে যে, সে তার নিজের চরণভূমি ঘেরাও করে নিয়েছে এবং অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। আর, রাত্রিতেই বা গান গায় কেন? চাঁদের প্রতি রতির আবেগে, না বদলেরের (Baudlaire) মতো তমোপ্রেমে? মোটেই না। রাত্রিতে যে গান গায় তার কারণ তার প্রজাতির অন্যান্যদের মতো তারও দেহে এমন এক ধরনের পরিপাকযন্ত্র আছে যা তাকে দিনেরাতে প্রত্যেক চার ঘণ্টা অন্তর আহার গলাধঃকরণে বাধ্য করে। শুঁয়োপোকা আহারের ফাঁকে ফাঁকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদেব সাবধান করে যাঃ! যাঃ! যাঃ! আমার অধিকারে প্রবেশ করো না যেন!

তারপর যখন ডিমে তা দেওয়ার পর্ব চলে তখন এই ভূমিপ্রীতির আর প্রয়োজন থাকে না, তখন তার দেহের একটা বিশেষ রসগ্রন্থীতে পরিবর্তন ঘটে, এবং এর ফলে তার সঙ্গীত-প্রবণতার বিলুপ্তি ঘটে। চিরন্তন বেদনা আর রাগ, অপাপবিদ্ধ

কণ্ঠস্বর এবং রভসউচ্ছ্বাসের বদলে আসে মূকত্ব। এই মূকত্ব কখনো কখনো ভেকধ্বনির মতো কর্কশ চীৎকারে ভেঙ্গে পড়ে।

এই চিরায়ত কাব্যউপাদান সম্বন্ধে যে নূতন জ্ঞান আহরিত হয়েছে তাও বিংশশতাব্দীর সাহিত্যরচয়িতার কাছে সম্ভাব্য কাব্যউপাদান। একে উপেক্ষা করা সাহিত্যিকের পক্ষে কাপুরুষতা। এই নূতন জ্ঞান কবিকে দুঃসাহসিক কর্মে আহ্বান করছে। এই দুঃসাহসিক আহ্বানে সাড়া না দেওয়া ভীরুতা। আর কী চ্যালেঞ্জ! গোষ্ঠীর ভাষা বা পাঠ্যপুস্তকের ভাষাকে পরিশুদ্ধ করে এমন একটা বহুব্যঞ্জনাময় ভাষায় পরিণত করতে হবে যা দুই স্তরের সত্যকে যুগপৎ প্রকাশ করবে। একস্তরে শুয়োঁপোকা, রসগ্রন্থী এবং ভূমিলালসার পরিপ্রেক্ষিতে বুলবুলের যে জীবন তার সত্য, আর অপরস্তরে যে মানুষ তার গানে কান পেতে থাকে সেই মানুষের সত্য। এই দ্বিতীয় ধরনের সত্য এমন এক প্রাণীর সত্য, যে প্রাণী একদিকে এই অমর বিহঙ্গকে নিছক পক্ষিতত্ত্ব দিয়ে বিচার করতে পারে, আবার অপরদিকে (পক্ষিতত্ত্বকে উপেক্ষা করে এবং নিজেদের কানের দুরপনেয় অশুচিতা সত্ত্বেও) "যে বিষণ্ণ বিলাপ প্রত্যাসন্ন শাদ্বলের কোল ঘেঁষে, নিস্পন্দ ঝরণার ওপর দিয়ে ভেসে চলে", তার রমণীয় ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়ে পড়ে। এ সত্য সেই বিচিত্র প্রাণীর সত্য যে নিশ্চিত জানে যে, ক্ষণস্থায়ী মাত্রই অন্য কিছুর প্রতীক নয়, তবু যার মনের একাংশ কল্পনায় রোমন্থন করে ফিলোমেলার (Philo-mela) উপকথা আর এর সঙ্গে জড়িত হিংসাপ্রতিহিংসার বীভৎস কাহিনী, অগম্যাবলাৎকার (in cestuous rape) এবং প্রতিশোধাত্মক হত্যার উপাখ্যান। সর্বোপরি এ সত্য সেই প্রাণীর সত্য, যার মনে যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যে কোনো উপকথাশ্রিত আদিপ্রতিমার (archetype) চেয়ে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে এমন এক অজ্ঞাত তত্ত্ব, যা চরাচরে সর্বত্র

বিত্তমান, যা জগতের মূলগত 'তথতা' (suchness), যা যুগপৎ ইন্দ্রিয়গোচর ও ইন্দ্রিয়াতীত, যা যুগপৎ ব্যক্তির 'অব্যবহিতে' গূঢ়তম ও অনির্বচনীয়তম 'অনুভবরূপে এবং 'বিপ্রকৃষ্টে' জড়বিশ্বের মনরূপে তথা সদাবিলয়মান ও সদানবায়মান অসংখ্য প্রপঞ্চের অখণ্ড মিলিত বিগ্রহের বিশ্বচেতনারূপে প্রকাশমান !

আটত্রিশ

চিন্তা স্থূল এবং জড়পদার্থ অকল্পনীয়ভাবে সূক্ষ্ম। শব্দের সংখ্যা সীমিত এবং তারা মাত্র কয়েকটা প্রচলিত, নির্দিষ্ট বিধি অনুসারেই বিন্যস্ত হতে পারে। বিচ্ছিন্ন অনন্য ঘটনাগুলিকে স্বর বলে ধরলে, তাদের বিভিন্ন মূর্চ্ছনার সমাবেশ (Counterpoint) যেমন অসীমিত তেমনি তাদের পরম্পরাও অনাত্মন্ত। বিজ্ঞানের পরিশুদ্ধ ভাষা কিংবা কাব্যের আরও ভাবাঢ্য, আরও শোধিত ভাষা কোনোদিন যে আমাদের এই জগৎ ও জীবনের স্বরূপপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই অভাবনীয়। এই সত্যকে সানন্দে স্বীকার ক'রে, আসুন আমরা বিজ্ঞানসাধকরা ও সাহিত্যশিল্পীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অজ্ঞাতের ক্রমঅপস্রিয়মান দিগন্ত পেরিয়ে এগিয়ে যাই !

অলডাস হাক্সলি
(Aldous Huxley)

একদিকে যুদ্ধ অন্যদিকে শান্তি, একদিকে করুণাহীন নির্মম পদার্থবিশ্ব অন্যদিকে আত্মার আকুতি, এই দুই দ্বন্দ্বের দোলায় বিংশশতাব্দীর যে সকল মণীষীর চিত্ত আলোড়িত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আমরা স্বনামধন্য অলডাস হাক্সলিকে দেখতে পাই।

অলডাসের মনীষার উত্তরাধিকারও বিখ্যাত। বিংশশতাব্দীর দিকপাল মনীষী টি. এইচ. হাক্সলির (T. H. Huxley) তিনি পৌত্র, স্বনামখ্যাত লিওনার্ড হাক্সলির (Leonard Huxley) তিনি পুত্র। এই তাঁর বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার। আর একদিকে তিনি বংশসূত্রে কবি ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বুঝি তাঁর শিল্পের উত্তরাধিকার। সারাজীবন তিনি এই দুই ভিন্ন উত্তরাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। জীবনের সায়াহ্নে, Literature and Science 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নিবন্ধে তিনি এই সামঞ্জস্যবিধানপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

অলডাস ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই ইংলণ্ডের সারে (Surrey) জেলায় জন্মেছেন, ইটনে (Eton) ও অক্সফোর্ডের (Oxford) ব্যালিওল (Balliol) কলেজে শিক্ষালাভ করেছেন। স্নাতক হয়েছেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

কৈশোর থেকে সারাজীবন তিনি দৃষ্টির ত্রুটির সঙ্গে লড়াই

করেছেন। ফলে আন্তরজগৎ থেকেই তাঁকে বেশীর ভাগ পোষণ-পদার্থ আহরণ করতে হয়েছে।

১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তিনি Athenaeum ও West-minister Gazette নামক দুটি সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি বিদ্রূপকে বাহন করে, শানিত বুদ্ধির তরবারি হাতে সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। এই পর্বের বিখ্যাত রচনা Chrome Yellow (১৯২১), Antic Hay (১৯২৩)। এই পর্বে অনেকগুলি বিদ্রূপাত্মক ছোটো গল্পও তিনি রচনা করেছেন।

১৯৩৯ থেকে তিনি আমেরিকার কালিফর্ণিয়ায় (California) বসবাস করতে শুরু করেন। এই দেশবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারারও বদল ঘটতে থাকে। ইতিহাস, দর্শন ও মিষ্টিক সাহিত্যের প্রতি তিনি তাঁর মনোযোগকে নিবদ্ধ করেন।

এরপব তাঁর দৃষ্টি চেতনার গভীরতর স্তরে প্রবেশ করতে থাকে। যেন সারাজীবন বুদ্ধির তীক্ষ্ণধার তরবারি চালনা করে যে সত্যকে তিনি জয় করতে পারেন নি, সেই সত্যকে আবিষ্কার করতে তিনি মনের গভীরে ডুব দিতে চেয়েছেন।

অনূদিত এই বই Literature and Science, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, তাঁর মৃত্যুব বৎসর, ১৯২৩-তে প্রকাশিত। তাঁর ক্লান্ত সন্ধানী আত্মা এই রচনায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুই বিশ্বদৃষ্টির (Weltanschauung) সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে চিরতরে বিশ্রাম গ্রহণ করেছে।

দেবব্রত রেজ

এই অনুবাদ ভাষাবিদ, প্রবন্ধকার, রসবেত্তা ও ঔপন্যাসিক শ্রীদেবব্রত রেজের কৃতি। বৈজ্ঞানিক অনুবাদের ক্ষেত্রে ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে রুশ জার্মান ইত্যাদি ভাষা থেকে অনেক উচ্চকোটির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবনের পর ইনি সরকারী কর্মে প্রবেশ করেন। সরকারী কর্মের অবসরে ইনি রুশ, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করেন। কিছুকাল পরে সরকারী কর্মক্ষেত্র থেকে সরে এসে ইনি বৈজ্ঞানিক অনুবাদকে পেশারূপে গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিট্যুটের সঙ্গে যুক্ত। এই পেশার অবকাশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে এঁর শিল্পীহাত দক্ষ থেকে দক্ষতর হয়েছে।

ইনি একাধারে সাহিত্যশিল্পী ও বিজ্ঞানভক্ত।

নির্দেশিকা

(১) Donner un sens plus pur aux mots de la tribu.
(২) মূলেব ১৩ পৃষ্ঠাব উদ্ধৃতি (ইংবাজী)
(৩) che non guastata non s´intende mai.
(৪) Et rose elle a vescu ce que vivent les roses, L'espace du matin.
(৫) la metempsychose des lys en roses
(৬) la mousse ou` le bouton de rose brille.
(৭) মূলেব ২০ পৃষ্ঠাব প্রথম উদ্ধৃতি (ফবাসী)।
(৮) মূলেব ২০ পৃষ্ঠাব দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(৯) মূলেব ২০ পৃষ্ঠাব তৃতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(১০) মূলেব ২১ পৃষ্ঠাব প্রথম উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(১১) মূলেব ২১ পৃষ্ঠাব দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(১২) Inflaming transubstantiations. (মূলেব ২২ পৃষ্ঠা)
(১৩) superessential unions (ঐ)
(১৪) absorbent enthusiasms (ঐ)
(১৫) abyssal liquefactions (ঐ)
(১৬) deific confrications (ঐ)
(১৭) insupportable assaults (ঐ)
(১৮) hypercelestial penetrations (ঐ)
(১৯) spiritual shamelessness (ঐ)
(২০) meridian holocausts in a visceral and medullar penetrability (ঐ)
(২১) Cauterio suave, regalada llaga (মূলেব ২৩ পৃষ্ঠা)
(২২) মূলেব ২৫ পৃষ্ঠাব প্রথম উদ্ধৃতি (ফবাসী)।
(২৩) মূলেব ২৫ পৃষ্ঠাব দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(২৪) মূলেব ২৬ পৃষ্ঠাব প্রথম উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(২৫) মূলেব ২৬ পৃষ্ঠাব দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)।
(২৬) Tel qu'en lui-meme enfin' 'eternitel le change.
(মূল ২৭ পৃষ্ঠা)
(২৭) Rature te vague litterature. (মূল ২৭ পৃষ্ঠা)
(২৮) মূলের ২৯ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)

(২৯) মূলের ২৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩০) মূলের ৩০ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩১) মূলের ৩০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংবাজী)
(৩২) মূলের ৩০ পৃষ্ঠার শেষ ও ৩১ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৩) মূলের ৩২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৪) মূলের ৩৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৫) মূলের ৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৬) মূলের ৪৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৭) মূলের ৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি (ইতালিয়ান)।
(৩৮) মূলের ৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৩৯) মূলের ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪০) Grau, theurer Freund, is alle Theorie, und gruen des lebens goldner Bauen. (মূল ৪৭ পৃষ্ঠা।)
(৪১) মূলের ৪৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪২) মূলের ৫৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ফরাসী)।
(৪৩) মূলের ৫৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪৪) মূলের ৫৮ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪৫) মূলের ৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪৬) মূলের ৮২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (প্রভঁ্যাসাল)।
(৪৭) মূলের ৮৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪৮) মূলের ৮৭ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৪৯) মূলের ৮৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫০) মূলের ৮৯ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫১) মূলের ৮৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫২) মূলের ৯৫ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫৩) মূলের ৯৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫৪) মূলের ৯৬ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫৫) মূলের ৯৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫৬) মূলের ৯৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।
(৫৭) মূলের ৯৬ পৃষ্ঠার শেষ ও ৯৭ পৃষ্ঠার প্রথম উদ্ধৃতি (ইংরাজী)।

श्री